

প্রথম সংস্করণ
আগস্ট, ১৯৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ
নভেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক :
শ্রীনিরঞ্জন বসু
গণসাহিত্য ভবন
১৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদপট ব্লক
পরিচয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রচ্ছদ লিপি
শ্রীকিশোরী ব্যানার্জী

মুদ্রাকর:
শ্রীনিত্যগোপাল চৌধুরী
জয়হিন্দ প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৪২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৯

বাঁধাই—এম. এ. রহিম এণ্ড কোং
১৬, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা-৯

স্বাধীনতা আন্দোলনের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

সংগ্রামী বন্ধুদের হাতে

॥ ভূমিকা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনা করেছেন পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের সঙ্গে—যা হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার সম্মিলিত রূপ—এক এবং অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু বহু দলে বহু মুখী।

আশা করি, এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পসমূহের মূল সুর থেকেই সপ্রমাণ হবে ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অন্তরের ঐক্য কত গভীর আর নিবিড়।

এই সঞ্চয়ন আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে সংকলিত গল্পসমূহের লেখক, যে সব পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে গল্পসমূহ সংগ্রহ করেছি তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। এই সুযোগে স্থানীয়ভাবে সাহায্যকারী সর্বশ্রী রাখালদাস চক্রবর্তী, সুনীল দেব, ধনপতি বসু, অরুণ রায়, কিশোরী ব্যানার্জী, গণেশচন্দ্র সাও ও অণু দাসের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি। প্রসঙ্গত গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীনিরঞ্জন বসু মহাশয়ের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কয়েকটি গল্প সরাসরি মূল ভাষা এবং বাকীগুলো অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করেছি।

বাহুল্য হলেও বলা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকদের জন্য বলে বাংলা গল্প এই সঞ্চয়নে রাখিনি। প্রাদেশিক সংস্কৃতির বিনিময় ঘটানোর এই প্রয়াসের জন্য পত্রপত্রিকা ও পাঠকমহলের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার আশা সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করে সমাপ্তি রেখা টানছি।

বেলঘরিয়া
॥ ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৭ ॥

॥ বি বিশ্বনাথম্ ॥

॥ গল্পসূচী ॥

কাশ্মীরী

এক বিঘৎ জমি আর একটি কুঁড়ে ঘর

আমীন কামীল

"বদমাইস, নিলজ্জ, বেহায়া কোথাকার! নিজের বাড়ীতে দু' দুটো সোমত্ত বোন আছে; তাদের নিয়েই ফুর্তি কর না। পোড়ার মুখো!" একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করামাত্র, রাহতী ক্ষুধার্ত সিংহীর মত গর্জে উঠলো সুলতান গুজবীর ছেলেটার উপর।

ঝাঁঝালো আওয়াজ শুনে পথের দু'চারজন কৃষক দাঁড়িয়ে পড়লো। তারাও কিছু গালাগালি দিলো ছেলেটাকে। জুতোপেটাই করতো। কিন্তু যাকে গাল দিচ্ছে সে ব্যাটাচ্ছেলেই ছিলো না ধারে-কাছে।

বিয়ের পর এই প্রথম তাকে সে ঠাট্টা করেছে। গাঁয়ে মুখরা মেয়ে হিসেবে রাহতীর নাম ছিলো আগেও। যেকেউ তাকে ইঙ্গিত করুক না কেন, তার বাপান্ত করতে কশুর করতো না। ফলে গাঁয়ের অনেক জোয়ান ছেলেই তাকে এড়িয়ে চলতো। রাহতীর জৌলুশটাও ছিলো ভালো। চেহারা সুন্দর নিটোল শ্যামবর্ণ, যে একবার তাকে দেখতো—তার ইচ্ছে করতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে। তবে বেশীক্ষণ তাকাতে অবশ্য পারতো না বেচারা। চোখে চোখ পড়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে, চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়ে লোক জমায়েৎ করে তাকে অপমান করে ছাড়তো সে। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও কোনো যুবকের সাহস হতো না কাছে ঘেঁষতে। যুবকদের কাছে দজ্জাল বলে পরিত্যজ্য, আর থুত্থুরো বুড়োদের কাছে আদর্শ মেয়ে বলে রাহতীর কদর ছিলো বেশ।

সেবছর ক্ষেতের ফসল কাটার আগেই রাহতীর বাবা মারা গেলেন। তার কিছুদিন পরে হঠাৎ কলেরায় মারা গেল বড়দাও। বড়দা আগে থেকেই পাঞ্জাবে

থাকতো। অন্য কৃষকদের মত চাষের সময় আসতো, মাস কয়েক থেকে কাজ ফুরোলো চলে যেতো। একা মা-মেয়ে দেওয়ান সাহেবের জমিতে থাকে। এক কোণে একটা কুঁড়ে ঘর। সে ঘরে রাহতী গোবরে পদ্ম ফুলের মত।

বাবা আর বড়দা মারা যাওয়ার পরেই মাকে চিন্তায় পড়তে হলো।

বাঁচার সংগ্রামে রসদ যারা জোগাতো তারা তো একের পর এক বিদায় নিলো। দিন-আনা দিন-খাওয়াদের ঘরে সঞ্চয় কথাটাও চির-অজানা। তাই ওরা মায়ে-ঝিয়ে পড়লো অকূল দরিয়ায়। সর্বগ্রাসী আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কীভাবে তারা বাঁচবে কিছুই ভেবে পায় না। দিনের পর দিন উপোসে কাটায়। ওদিকে নোটিস আসে—দেওয়ান সাহেবের হুকুম, ছেলে আর বুড়ো মারা গেছে। কাজেই তাদের ভাগচাষের জমিটা ছেড়ে দিতে হবে। কুঁড়ে ঘরটাও ছাড়তে হবে।

বাড়ীতে চাষের কোন ব্যাটাছেলে না থাকলে জমি তো ছাড়তে হবেই। কেউ গতরে খাটতে না পারলে জমি তার থাকে না। তার সঙ্গে ঘরবাড়ীও। রাহতীর মার মন ব্যথিত হয়ে উঠলো। অনেক পুরুষ ধরে তারা ঐ কুঁড়েতেই আছে মাথা গুঁজে। জমি গেলে খাবে কি? ঘর ছাড়লে থাকবে কোথায়!

নিজেদের জমি বলতে তাদের কিছু নেই। রাহতীর বাবা মারা যাওয়ার পর সব জমি নায়েব নিয়ে নিলো। কারণ জিজ্ঞেস করলে মোহরের ছাপ দেওয়া বড় বড় কাগজ দেখালো নিরক্ষর মা আর মেয়েকে। হিসেব চাইলে নায়েব বলে গেলো, "কুড়োবো কুড়োবো, কুড়োবো লিজ্জে, কাঠায় কুড়োবো কাঠায় লিজ্জে···কি কিছু বুঝেছিস?" তারা বোবা দৃষ্টি মেলে মাথা নেড়ে জানালো, কিছুই বুঝতে পারেনি। তারপর মিটমিট করে রাহতীর দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে নায়েব বলে, "কাজেই ও-জমিতে তোদের আর কোন দাবী নেই। টিপ দে······অ্যাঁ ······অ্যাঁ······এই খানে! ব্যাস যা!"

টিপ-সই দেওয়ার পর তাদের নিজের জমি গেছে। ভাগচাষের জমি আর কুঁড়ে ঘর বাঁচাতে হলে বাড়ীতে খাটার মতন একটা ব্যাটাছেলে চাই। রাহতীর মা ঠিক করলো মেয়ের বিয়ে দেবে। ঘরজামাই করে রাখবে। জামাই খোঁজা শুরু

হলো। ডজন খানেক পাত্রের বাবাকে অনেক খোশামোদ করে অবশেষে একটিকে রাজী করানো গেলো।

জামাইয়ের নাম কাদির। বিয়ে হলো রাহতীর। ছেলেটি শাশুড়ীর মনের মতই হলো – উঠতে বলে ওঠে, বসতে বললে বসে। আকারে পুরুষ, প্রকারে নারী। রাহতী এধরনের ছেলেকে বিয়ে করতে মনে মনে অনিচ্ছুক হলেও বৃদ্ধা মার উৎকণ্ঠিত কাতরতায় সবকিছু বিচার করে রাজী হয়েছিলো। বিয়ে না করলে খাবে কি ? দাঁড়াবে কোথায় ?

বিয়ের পর গাঁয়ের ছেলে, বুড়ো, মহিলা, যুবক সবাই দেখতে এলো ঘরজামাই কাদিরকে। কাদিরের চেহারা লিকলিকে। গায়ের রং আলকাতরায় চোবানো বা আরো কালো কিছু দিয়ে বার্নিশ করা।

সবাই অবাক হয়ে গেলো। যুবকরা বসলো দাওযায গুলতানি করতে। কেউ হাত কামড়ালো। আবার কেউ বগল বাজালো। রাহতী কিন্তু নীরবে নিজের ঘরকন্নার কাজ যথাযথভাবে করে যেতে থাকলো। পাড়ার মেযেরা পাতকুয়ায় জল আনার পথে কানাঘুষা করতে লাগলো।

মা আল্লাকে ধন্যবাদ জানালো মেয়ে তার কথা শুনেছে বলে। রাহতী তার কথা রেখেছে। কুঁড়ে ঘর আর ভাগচাষের জমি বাঁচিযে দিয়েছে। তা না হলে পথে দাঁড়াতে হতো।

ব্যাটাছেলে এলেও নায়েব তাদের ঘরে থাকতে দিতে সহজে রাজী হলো না। অনেক খোশামোদ করতে হলো। এমন কি অবশেষে রাহতীর মা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কসাবা* রেখে রাজী করালো।

জমিতে চাষ দেওয়ার আর মাত্র এক মাস বাকী। দেওয়ান সাহেব জমিগুলো দেখতে এলেন। গাঁয়ের ভাগচাষীরা সব বেরোলো তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। কিছু কিছু কৃষক মাথা নীচু করে সেলাম জানায়। বৃদ্ধরা দীর্ঘায়ু কামনা করে।

দেওয়ান সাহেবের চেয়ে রাহতীর দিকেই আড়চোখে তাকাতে বেশী তৎপরতা দেখালো সুলতান গুজবীর ছেলে সেদিন। মাঝে মাঝে তার মনে পড়লো সেই অপমানের কথা।

*কাশ্মীরী মুসলমান মহিলাদের মাথায় দেওয়ার বিশেষ ওড়না।

দেওয়ান সাহেব ঠাঁট বজায় রেখে মুচকি হাসিতে প্রজাদের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। কেউ তাকায় তাঁর দিকে ভয়ে, কেউ বা সম্মানে। রাহুতী আর তার মা তাঁর দিকে তাকিয়ে নিজেদের জমি আর কুঁড়ে ঘরের কথা ভাবে।

ইনি ছোট দেওয়ান সাহেব। এতদিন পড়াশুনায় ব্যস্ত ছিলেন। আসতে পারেননি জায়গা-জমি দেখতে। এতদিন বড় দেওয়ানই দেখাশুনা করতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে পোলো খেলার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে যান। ফলে একটা পা প্রায় খোঁড়া হয়ে যায়। বাপের অবস্থা বুঝে ছোট দেওয়ান সাহেব নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েন; তাঁর টনক নড়ে। জমিদারী দেখার দিকে মন যায়। আজ তার প্রথম দিন।

গাঁযে আসার সাত আট দিন পরেই ছোট দেওয়ান সাহেব জমি নূতনভাবে ঢেলে সাজালেন। একাজ প্রত্যেক জায়গীরদারই দু'চার বৎসর অন্তর করে থাকেন। এব্যবস্থায় দুটো লাভ। প্রথমতঃ, কোনো কৃষক একই জমিতে বেশীদিন থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সময় কৃষকদের গাঁট কাটা যায়। সেলামী আসে জাযগীরদারদের পকেটে।

নূতন ব্যবস্থার নোটিস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের ভাগচাষীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। গাঁয়ের লোক নারী-পুরুস নির্বিশেসে দেওয়ানজীর গোমস্তার ঘরের সামনে জড়ো হয়ে কানাঘুষা শুরু করে দেয়।

প্রত্যেকের চোখে-মুখে আশা-নিরাশায় দ্বন্দ্বের ছাপ সুস্পষ্ট। সুলতান গুজরীর জোয়ান ছেলেটা কোনো কিছুকেই পরোয়া করতো না। কিন্তু সেও আজ ভেজা বেরালটির মত বাবার পাশে চুপ করে বসে কি যেন ভাবছিলো। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে এর জমি ওকে আর ওর জমি তাকে ভাগচাষের জন্য দেওয়া হবে। এতে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। কৃষকদের ভাগ্যে এ ব্যবস্থার কথা ভগবান লেখেন না, লেখেন দেওয়ান সাহেব, শুধু লেখেন না—লেখেন আর মোছেন।

গোমস্তার ঘরে ছোট্ট জানলার পাশে নূতন বউয়ের মত জড়োসড়ো হয়ে বসে সামনের কাগজগুলোতে কলমের দু'একটি আঁচড়ে বাইরে দাঁড়ানো কৃষকদের ভাগ্য

নির্ধারণ করছেন দেওয়ান সাহেব। তাঁর সামনে লক্ষ্মীর একটি ফটো ফুলের মালায় ডুবে গেছে। দেওয়ান সাহেবের গোমস্তা এক একটি কাগজ কৃষকদের হাতে দিয়ে কর্তার হুকুম তামিল করছিলো। এ হুকুম তামিল না করলে ঘরসুদ্ধু উপোস করতে হবে। পেটের দায়ে ওরা কাজ করে। উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করে।

কিষানরা নিজেদের অর্পণপত্র পেলো। আহম্মদ বানী এবং সুলতান গুজবীর জমি গাঁয়ের সেরা জমি। খুব উর্বর। সে-জমি পেলো মুহম্মদ মালিক এবং কাদির বিঙ্গ। ওদের আগের জমি ছিলো বন্ধুর, অনুর্বর। তার বদলে ওরা এত ভাল জমি পেলো! খবরটি পেয়েই আহম্মদ বানী এবং সুলতান গুজবীর মুখ ফ্যাকাশে হযে গেলো। তাদের দম বন্ধ হযে এলো। সুলতান গুজবীর ছেলের অবস্থা আরো কাহিল। তার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেলো। ছেলের ধারণা ছিলো ঐসব জমির সর্বময় কর্তা তার বাবা নিজেই।

মেয়েরাও জল আনার সময় পথেঘাটে জটলা পাকিরে কানাঘুসা করে। আহম্মদ বানী এবং সুলতান গুজবীর বউয়েরা নিজেদের জমি বদলের জন্য ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। তাদের মনে পড়ে বড় দেওয়ানজীর কথা। লোকটি খুব ভালো ছিলো। তারা খোদাকে অভিশাপ দেয। ওরা দু'জনে রাহতী এবং মুহম্মদ মালিকের বোন খদীজীকে ঘুরে ফিরে দেখতো। মনে মনে তাদেরও অভিশাপ দিতো। রাহতীর মা কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ জানিযে দেওয়ানজীকে আশীর্বাদ করে। আহম্মদ বানী এবং সুলতান গুজবী উদাস চোখে দেওয়ানজীর গোমস্তার সঙ্গে ফিস্ ফাস কথা বলে। কাদির বিঙ্গ এবং মুহম্মদ মালিক আত্মগর্বে ফুলতে থাকে। তাদের আনন্দ, তারা ভালো জমির অধিকারী হয়েছে। তারা আশীর্বাদ দেয় ছোট দেওয়ানকে।

এই ব্যবস্থায় কৃষকদের মধ্যে নানা আলোচনা চলতে থাকে। তারা ভাবে, আহম্মদ বানী ও সুলতান গুজবী প্রচুর ক্ষেত-খামারের কাজ করেছে। তাদের বলদ আছে, বহু লাঙ্গল আছে। কিন্তু এই কাদির বিঙ্গ আর মুহম্মদ মালিক এত বড় জমিটাকে কি করে সামলাবে? এত সুন্দর উর্বর জমি নষ্ট না করে ফেলে! কিন্তু এটাও তারা ভাবে, ঐ জমি ওরা কেন পেলো? কি করে পেলো? কারণটা কি?

রহস্যটা কোথায় ? সুলতান গুজবীর ছেলে রটিয়ে বেড়াতে লাগলো খদীজী এবং রাহতী এর মূল কারণ। কিন্তু লোকে যে তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বলে—ওসব আজগুবি কথা আমাদের কাছে নয়, অন্য লোকদের কাছে বলো। আমরা জানি কেন তুমি রটাচ্ছো। প্রথমতঃ তামাদের জমি কাদির বিঙ্গ পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তুমি ঠাট্টা আর কুৎসিৎ ইঙ্গিত করেছিলে বলে রাহতী তোমাকে জুতো-পেটা করেছিলো। খদীজীর কথা তবু না হয় বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু রাহতীর নামে ওসব কথা একেবারে অবিশ্বাস্য।

ছোট দেওয়ান বাপের মত মাসে এক আধবার দেখশুেনা করতে আসেন। পাঁচ দশ দিন থেকে আবার শহরে ফিরে যান। এভাবে দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বছর কেটে গেলো। তারপর হঠাৎ পাকিস্তানী বর্গীরা দিলো হানা। তাদের মেরে তাড়িযে দিলো দেশের লোক। লোকের মনোভাবের তখন পরিবর্তন হযেছে, তাদের মনুষ্যত্ব জেগে উঠলো, তাদের ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাবনা বদলালো। সারা কাশ্মীর এক নূতন জীবনের ছোঁয়ায় প্রাণচঞ্চল হযে উঠলো। দেওযান সাহেব দু'বছরের মধ্যে আব গাঁযে আসেননি। তাঁর ধারণা, দেশেব লোক যখন ক্ষেপে য'য তখন ঘরে বসে জানালা দিয়ে বাইবে তাকিযে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাইরে বেরোনো অনুচিত।

এই সমযের মধ্যে জায়গীরদারদের জমি ভাগচাষীদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে। ভরণপোষণের উপযুক্ত জমি অবশ্য দেওয়ান সাহেবও পেয়েছেন। অন্যান্য জমিদারদেব মত তাঁর প্রাপ্য জমি ইচ্ছা অনুযায়ী বেছে নেবার অধিকার তিনিও পেযেছিলেন। আব তারই ফলে কাদির বিঙ্গ এবং মুহম্মদ মালিক আজও তাঁর ভাগচাষী। ভাগচাষীদের এখন মাত্র এক-চতুর্থাংশ দেওয়ানকে দিতে হয়। আজ আর দেওয়ান সাহেবরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মত দু'একটি কালিব কুটিল আঁচড়ে কৃষকদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন না। খেয়াল-খুশি মাফিক এর জমি ওকে আর ওর জমি তাকে দেওয়ার দিনগুলো এক বছরের ঝড়ো হাওয়ায় কোথায় যেন উড়ে গেছে।

নতুন কাশ্মীরের জীবনে এসেছে তারুণ্যের ঢল। আর সেই জোয়ারের দুকুল-প্লাবী ধারায় ধুয়ে গেছে বিগত দিনের অনেক প্রথাপদ্ধতি। তাইতো দেওয়ান তাঁর

'ভাগচাষী দুজনের কাছ থেকে যখন প্রাপ্য ফসলের ভাগ নিতে এলেন তখন কেউই এলোনা আগের মত তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে কেউ সেলামও করলো না।

স্বামীর জন্য খাবার আনতে মাঠ থেকে ঘরের দিকে যাওয়ার পথে রাহতীর নজর পড়লো দেওয়ান সাহেবের উপর। তিনি যাচ্ছিলেন মুহম্মদ মালিকের জমির দিকে। দেওয়ান সাহেব তাকালেন রাহতীর দিকে। চোখাচোখি হয়ে গেলো। রাহতী এমনিতেই নিটোল সৌন্দর্যময়ী। তার উপর বিয়ের জল পড়েছে। তারুণ্যের পূর্ণতা তার দেহে এনে দিয়েছে অপূর্ব ছন্দোময়তা। হাঁটার সময় দোলা লাগে শরীরে। হাসির সময় গালে টোল পায়। কিছুক্ষণের জন্য দেওয়ানজীর দিকে ঘুরে তাকায় তন্বী রাহতী। মনে হলো ওর চোখদুটি মুহূর্তে যেন অতীতের স্মরণীয় কিছু একটা খোঁজবার চেষ্টা করে। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটি তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হারিয়ে যাওয়া সেই স্মৃতিকে আবিষ্কারের আনন্দে। মুচকি হাসির তরঙ্গের দোলায় মুখ-চোখের রেখাগুলিকে ছন্দায়িত করে হঠাৎ ঘুরে দৌড় দেয় সে ঘরের দিকে।

রাহতী ঘরে পৌছালো। সকাল থেকেই তার মাথা ধরা। খানিকক্ষণ আগে ন্যাকড়ার পটি বাঁধা ছিলো কপালে, জ্বর এসেছিলো, গা পুড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু এখন যেন তার সব ব্যথা, বেদনা, জ্বর কর্পূরের মত উবে গেছে। তৎক্ষণাৎ ময়লা কুচৌলা (জামা) খুলে ফেললো। ঘরের কোণ থেকে একটি পুঁটুলি বের করে তার থেকে বিয়েতে পাওয়া জামা তুলে নিয়ে পরে। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে নেয়। মুখহাত ধুয়ে নেয়। ছোট্ট আরশিতে মুখখানা দেখে নেয়। মুচকি হাসে। তারপর ভাতের থালা গামছা দিয়ে পুটুলি বেঁধে মাথায় করে বেরুতে বেরুতে ফিরে আর একবার আরশিতে মুখখানা দেখে দ্রুতবেগে চলে যায় ক্ষেতের দিকে।

রাহতী খুব জোর হাঁটছে। দেওয়ানজীর আগেই সে পৌছোবে ক্ষেতে। রাহতীর মুখে লজ্জা আর অনুরাগের রেখাগুলি খেলা করছে। দেওয়ানজীর সঙ্গে কাটানো অতীতের সেই দিনগুলি এক এক করে মনে পড়ে।

সেদিন সে দেওয়ানজীর কাছে গেছে। দেওয়ানজীর শোবার ঘরে খদীজী। দেওয়ানজী আদর করে তার কপালের চুল ঠিক করে দিচ্ছেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি আর খদীজীর দৃষ্টি মিলে গেল। মরমে মরে গেলো খদীজী। লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়লো, সারা শরীরে ঘাম ঝরতে লাগলো। রাহতীর দৃষ্টি সইতে না পেরে খদীজী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

খদীজীর অবস্থা দেখে দেওয়ান সাহেব হো হো করে হেসে ফেললেন। তার হাত ধরে বললেন, "তোমরা একে অপরকে দেখে লজ্জা পাচ্ছো কেন? এসো আজ থেকে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে দি। নাও এবার লজ্জা ছাড়ো দিকি।" খদীজীর মুখ কালো আর লম্বা হয়ে গেলো। মাথা হেঁট করে সে এতটুকু হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। তারপর রাহতীকে দেওযানজী নিজেই খাটিয়ার উপর শুইয়ে দিযে দরজা বন্ধ করে দেন।

"দেওয়ানজী, লক্ষীটি, ওর সামনে অত জোরে দরজা বন্ধ করাটা ভালো হয়নি। আর ও থাকতে থাকতেই আমাকে ডেকে পাঠানোও উচিত হয়নি।" রাহতীর মুখ দিয়ে অনেক কষ্টে কথাগুলো বেরুলো। দেওযান সাহেব এই কথায় আর এক দফা হো হো করে হাসলেন। টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে একটা লাড্ডু তার মুখে পুরে দিলেন।

রাহতী পথের চড়াই উৎরাইগুলো পেরিয়ে এমনভাবে ছুটছে যেন একটু দেরী হলেই তার কিছু একটা হারিয়ে যাবে। পথ চলতে চলতে অতীতের সব দৃশ্য তাব চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

রাহতী পৌছালো ক্ষেতে কিন্তু দেওয়ান সাহেব তখনও পৌছাননি। নিজের উপর তার খুব রাগ হলো রাহতীর। তার মনে চিন্তা আর ব্যাকুলতা দেখা দিলো, তার পালাটা না খদীজী নিয়ে নেয়। খদীজীই আগেভাগে দেখা করে এতদিন আসেনি বলে অনুযোগ করার পর সে বললে কথাটা পুরনো হয়ে যায়। খদীজীর উপর ঈর্ষা হলো তার। এত ঈর্ষা আগে কোনোদিন হযনি।

রাহতী নিজের ক্ষেতে পৌছে ভাতের থালা কাদির বিঙ্গের সামনে

রাখে। রাহতীকে দেখে সে অবাক দৃষ্টি মেলে বলে, "বাবাঃ, এত সাজগোজ যে! কী ব্যাপার, আজ যে তুমি একেবারে নতুন বউ সেজে এলে রাহতী! না, এ-শালা আমিই বুড়ো হয়ে গেছি। তোমার মধ্যে যে মাদকতা আগে ছিলো আজও তা অটুট আছে।"

"যা অসভ্য কোথাকার, তুমি আবার বুড়ো হলে কোথায়?" কথাটি বলেই গা ঢলিয়ে স্বামীর মুখে একগাল ভাত পুরে দিয়ে হি হি করে হেসে লুটোপুটি খায় রাহতী।

কাদির বিঙ্গের মা কাছেই ছিলো। বউয়ের ব্যবহার দেখে মনে মনে খুশী হয়। তৃপ্তিতে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। কাদির বউয়ের হাত ধরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মেরে হি হি করে হাসতে হাসতে তর সামনে ফণা তোলা সাপের মত দু'একবার দুলে রাহতী অদূরে মিলিয়ে যায়। অতীতে রাহতী দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতো অদূরের ক্ষেতে। সেদিকে ছুটে যায়..... কাদির বিঙ্গ ভাবে তার কথায় বুঝি লজ্জা পেয়ে রাহতী চলে গেছে।

রাহতীর বুক খুব ঢিপঢিপ করছিলো। উত্তেজনায় হাতের মুঠো বারবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। আড়াই বছর আগেকার শক্তি যেন সে আজ ফিরে পেয়েছে। নিজের ক্ষেতটি পেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে যেন কে সিন্দুর লেপে দেয়।

দেওয়ান সাহেব আজ পর্যন্ত রাহতীকে দেখে এসেছেন নোংরা তেল চটচটে পোশাকে। আজ তাকে নূতন বউয়ের পোশাকে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁর মন ভরে যায়। আনন্দের সঙ্গে তিনি বলে ওঠেন, "এই যে আমার রাহতী রানী, ভালো তো? তুমি হয়তো খুব চটে গেছো, আড়াই বছর এদিকে উঁকি মারতে পারিনি বলে।' রাহতীর সান্ত্বনা—খদীজী তার পালা কেড়ে নেয়নি।

সাহেবের মনে এসেছে উন্মাদনা। আবেগে রাহতীর তনুদেহখানি আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাহতী যা করে বসলো তা স্বপ্নের অতীত। হঠাৎ কে যেন তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিলো। সুতীব্র কষাঘাতে স্মরণ করিয়ে দিলো তার অতীত অবস্থা, যে অবস্থায় পড়ে

বাধ্য হয়ে একদিন তাকে আর তার মত আরো কত মা-বোনদের ইজ্জত বিক্রি করতে হয়েছে ওদের কাছে। আজ দিন বদলেছে! মেয়ে-পুরুষ জোট বেঁধে লড়ছে জমির জন্য! আর সে কিনা দেওয়ান সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করবে আবার! ক্রোধে ঘৃণায় রাহতীর মন ছিঃ ছিঃ করে ওঠে।

রুদ্ধ রাগে গুমরে উঠে, ক্ষুধার্ত সিংহীর মত গর্জন করে বলে, "কাকে, রানী বলছো? আমাকে? বদমাইস্! নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার? নিজের বাড়ীতে মা-বোন নেই? মেয়েদের উপর তোমার চোখ পড়ার আগে অন্ধ হয়ে যাক।"

কথাটি বলে তার জমিতে তার নাকের ডগায় থুথু ফেলে ঘুরে ক্রুদ্ধ হিংস্র সর্পিনীর মতই সে ধান-ক্ষেতের মধ্যে শন্ শন্ করে মিলিয়ে যায়।

দেওয়ান সাহেবের চোখে কে যেন পিচকারী দিয়ে হলুদ রং ছোঁড়ে। পায়ের তলার মাটিতে যেন ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে। মাটি সরে যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত এধরনের কথা শোনেননি। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে নিজের ক্ষেতের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুর ঘুর করতে থাকেন। ক্রমে দেওয়ান সাহেবের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় রাহতীর এই আকস্মিক ব্যবহার। তিনি বুঝতে পারেন, এতদিন যে ধারণা নিয়ে তিনি রাহতীকে তাঁর শয্যায় এনেছেন সেটা ভুল। রাহতীর কাছে যৌন আবেদন বড় ছিলো না, বড় ছিলো জমির সমস্যা। তাই এক বিঘৎ জমি আর একটি কুঁড়ে ঘর হাতে রাখার জন্যই রাহতী সেদিন তার মার কথা রেখেছে, পৌরুষহীন, নিতান্ত শান্তশিষ্ট, গোবেচারা কাদির বিঙ্গকে বিয়ে করেছে।

চোর !

কৃষন চন্দর

লোকটা এসেই আমার পাশে ধপ করে বসে পড়ল। তাকে দেখে আমার মন ঘেন্নায় বিষিয়ে গেল। গায়ে ময়লা জামা, পচা পাশ-বালিশের ওআড়ের মত একটি পাজামা। তার মাঝে মাঝে তালি দেওয়া। মনে হয় যেন সে সবে ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তোবড়ানো গাল, চোখ কোটরস্থ। কিন্তু জ্বলছে সর্পিনীর চোখের মত। চেহারায় সৌন্দর্য বা কোমলতার নাম গন্ধ নেই। ঘাড়ে এক গাদা ময়লা, চিমটি দিলে উঠে আসে। মরচে-পড়া লোহার মতই তার গায়ে ময়লার একটা স্তর পড়ে গেছে। যখন তখন গা চুলকাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় বিন্দু বিন্দু রক্তও বেরুচ্ছে। কাছে এলেই আপসে রুমালটা নাকের কাছে চলে যায়।

ঈস্, কী বড় বড় নখ! নখের ভেতর ময়লাও জমেছে প্রচুর। আবার কুৎসিৎ আঙুল দিয়ে নাকটা খুঁটে খুঁটে সামনের সিটের নীচে পুঁছে দিচ্ছে। সারা গা বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে। পাশে বসেই খক্ খক্ করে কাসতে থাকে। আর আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে পাশের জানালা দিয়ে থুথ্ ফেলে। ফিরে আবার এসে বসে। তার নোংরা দুর্গন্ধ জামাটা আবার নজরে পড়ে। গা গুলিয়ে যায়। বমি আসে। মনে মনে ঠিক করি বাড়ীতে গিয়েই ডেটল্ দিয়ে ভাল করে ধুয়ে মুছে নেব, বিশেষ করে ওর ঝুঁকে পড়ার সময় আমার শরীরের যে অংশ ছুঁয়েছে! ঈস্ .... জামার ডান দিকের কোণটি কি নোংরা হয়ে গেলো! এদের জন্য কেন যে একটা আলাদা বাস করে না! একটা লোকের উপস্থিতি যে বাসের সমস্ত আবহাওয়াটাকে কতখানি নোংরা করতে পারে, আর কত লোকের মনকে অস্বস্তিতে ভরে তুলতে পারে আজ হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

সরকারের প্রতি মন বিরূপ হয়ে উঠে—ট্যাক্স নিবার বেলায় ষোল আনা, কিন্তু জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি চরম উদাসীন !

বিরক্তির সঙ্গে আমি একটু ঘুরে লোকটার দিকে আর একবার তাকাই। লোকটাও ঘুরে আমার দিকে তাকালো। তার চোখ দুটি দিয়ে সে আমাদের সবাইকে পুড়িয়ে ফেলতে চায়। এই সময়ে কণ্ডাক্টার কাছে আসে। নোংরা লোকটি পাজামার পকেট ঘেঁটে ঘুঁটে একটি আনী বার করে। আন্ধেরীর টিকিট নেয়। যা বাবা! লোকটা সেই আন্ধেরী পর্যন্ত যাবে! এই বাসেই! আর তাও আমার পাশেই! উল্লুক কোথাকার! বসবি তো বস, আমারই পাশে। ঈস্, আজকেই পাট ভেঙে পরেছি জামাকাপড়, কত রং-বেরংয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা লোক উঠছে, নাবছে। কত লিপস্টিক লাগানো সুন্দরী মেয়েদের চলছে আনাগোনা।

এই ধরনের একটি সুন্দর বাসে শেষে উঠলো কিনা এই লোকটা! ওকে কেউ ফুটপাথ থেকে তুলে বসিয়ে দিল নাকি বাসে? দুনিয়ায় যে কত রকমের নচ্ছার লোক আছে, থুঃ!

আজীবন আমার পরিচ্ছন্ন একটা রুচি আছে। নিজের পছন্দমত ভাল দর্জির কাছে পোশাক বানাই। স্টীমলণ্ড্রিতে ধোয়াই। আর বাসে ট্রামে উঠে যাতে পাট না ভেঙে যায় তার চেষ্টা করি। কিন্তু এদের জ্বালায় আমার সে গুড়ে বালি না পড়ে কি যাবে? এখন কী যে করি? মনটা খিঁচিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এইসব ভাবনাচিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে আনবার জন্য কোলের থেকে গুটানো বইটার পাতা ওল্টাতে শুরু করি।

বেশ রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চারে মেশানো উপন্যাস। এক মেয়ে তার বাবার প্রেমিকাকে শত্রু ভাবে। তারপর এমন পথ বেছে নেয় যে প্রেমিকা আত্মহত্যার পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। সবে মাত্র পৃষ্ঠা দুয়েক পড়েছি এমন সময় লোকটি উঠে সব মাটি করে দেয়। ওর ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাসে যেন অস্বস্তির আলোড়ন শুরু হয়। সবাই সঙ্কুচিত হয়ে সরে যাচ্ছে। আমি বই বন্ধ করে তাদের দিকে তাকাই। ইতিমধ্যেই লোকটি এসে ধপ করে পাশে বসে পড়েছে।

বেচারা বাস-কণ্ডাক্টার! নতুন যাত্রীদের উঠিয়ে নিয়ে টিকিট কাটতে শুরু

করে। কিন্তু তারই বা আক্কেল কেমন? বাসে সবাইকেই যে তুলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এই নোংরা লোকটিকে বাদ দিলেই তো পারতো। গা দিয়ে ভুক্ ভুক্ করে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। বাধ্য হয়ে বইটা মুড়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

বাস-কণ্ডাক্টার স্টপেজে লোক তুলছে, টিকিট কাটছে। মাঝে মাঝে নয়া পয়সা পুরনো পয়সা নিয়ে বচসা হচ্ছে যাত্রীদের সঙ্গে। তারি ভিতর আবার বাস চালু করার ঘণ্টিও মারছে। কণ্ডাক্টারের কথাবার্তা শুনে মনে হল শাহানপুর অথবা মেরাট এলাকার লোক। তার মাথার টুপিটা একদিকে বেঁকে গেছে।

খাকি কোটে দুটো বোতাম নেই। বাকি বোতামগুলো লাগানো ওলট পালট হয়ে গেছে। লোকটাকে দেখে কিন্তু হাসি পাওয়ার উপায় নেই। সব সময়ে মুখে তার গাম্ভীর্য। সমস্ত কিছু মিলিয়ে তাকে দেখে চোখে ভাসে কোনো ক্ষুধার্ত পশুকে। সে যেন তার শিকার খুঁজছে। লোকটা হাঁপাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে তার কপাল থেকে। আমার পেছনের সীটে দুজন যুবক বসেছিল। তারা একটি টাকা দিয়ে দুটো টিকিট চাইলো। কণ্ডাক্টার তাড়াতাড়ি দুটো টিকিট দিলো। তারপর যুবক দুজন পয়সা ফেরৎ চাইলে বললে, "দিচ্ছি।"

পরক্ষণেই সামনের স্টপেজে নেমে যাওয়ার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে যাওয়া লোকদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এগিয়ে যায়। দুজন নেমে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলো— কণ্ডাক্টারটি ঠিক ধরে আদায় করে নিলো দুটো টিকিটের পয়সা। লোকগুলো উত্তপ্ত মেজাজে পয়সা দিয়ে টিকিট না নিয়েই চলে যায়। আর সে তাদের দিকে দুটো টিকিট ছুঁড়ে ঘণ্টি দিয়ে বাসে উঠে পড়ে। পরের স্টপেজেও প্রায় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বিপদ দেখা দেয় একজন আধা বুড়ি মহিলার একপাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাসে ওঠায়। মহিলাটি কুৎসিৎ। মোটা ভোঁতা চেহারা। গায়ের রং কালো হলেই মানানসই হতো। বড় বাচ্চাগুলোকে বসিয়ে দিয়ে কোলের বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে শুরু করলো। তার উপস্থিতিতে বাসের আবহাওয়াটা কেমন যেন আরও বেচাল হয়ে গেল। ও না উঠে সুসজ্জিতা সুপ্রসাধিতা কোন তন্বী উঠলে সীটটা কি সুন্দর অলঙ্কৃত হতো! তার ওঠার

সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই চার ছয় জন দাঁড়িয়ে পড়তো তার জন্য নিজেদের সীট ছেড়ে দিতে। হয়তো দুজন যাত্রী তার সঙ্গে আরও উঠতো। আবার নামতোও তার অনুসরণে। কিন্তু তা আর হলো কোথায়? বাচ্চাগুলোও মায়ের রূপ পেয়েছে। তার মধ্যে দুজনের আবার নাক দিয়ে সিক্‌নি গড়াচ্ছে, জিভ উলটে সেই সিক্‌নি চেটেও নিচ্ছে।

ঈস্, বাচ্চাগুলো এত নোংরা থাকে কি করে! জানোয়ারের বাচ্চাকেও তো তার মা চেটে পরিষ্কার রাখে। এরা মানুষ, আশ্চর্য!

ভীড় খুব বেড়ে উঠেছে। তারপর যারা উঠলো তারা আর বসতে পারলো না। পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দেওয়া শুরু করলো। ওরই মধ্যে কণ্ডাক্টর পেছন থেকে সামনে আর সামনে থেকে পেছনে ক্ষুধার্ত বাঘের মত ঘুরতে থাকে। তার বড় বড় চোখ শুধু সকলের হাতের দিকে। কার হাতে টিকিট, কার হাতে পয়সা, কে ওর হকের কড়ি মেরে দিয়ে কেটে পড়বার তালে আছে সে দিকে নজর রাখতে হচ্ছে ওকে। এই ব্যস্ততার মধ্যে ওর হঠাৎ মনে পড়লো কে যেন টাকা দিয়েছে। খুচরো পয়সা পাবে। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে পয়সাগুলো গুণে আচমকা আমার পাশের নোংরা লোকটার হাতে রেখে দেয়। রোগা প্যাঁটপ্যাটে লোকটা আশ্চর্য হয়ে বড় বড় চোখে পয়সার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার হাতটা একরকম অনিচ্ছাকৃতভাবেই যেন মুঠো হয়ে পাজামার পকেটে ঢুকে যায়। তারপরেই লোকটা সামনের দিকে এমনভাবে মুখ রেখে বসে থাকে যেন কিছু ঘটেছে বলে তার কিছুই জানা নেই।

পেছনের সীটে যুবক দু'জন তাদের মুখোমুখী-বসা কমলালেবুর রঙের শাড়ী-পরা তরুণীটির দিকে অনন্যমনে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ। ওদের যৌবনের রঙীন চোখে কত রঙীন শাড়ী কতবার নাড়া দিয়েছে; সাড়া জাগিয়েছে মনে। কিন্তু কাউকেই সারা জীবনের মত ধরে রাখার সাহস করে এগোতে পারে নি ওরা। এই যুবতীর দিকে তাকিয়ে থেকে ওরা জানতেই পারে নি কখন ওদের তের আনা অন্যের পকেটে চলে গেছে। বর্তমানে সবার উপরে টাকা সত্য হলেও মানুষের মনের উপর তো আর উঠতে পারে নি! পক্ষীরাজ ঘোড়া আর রাজকন্যা মানুষের মনে এখনও উঁকি মারে বৈকি!

একটু পরেই লিপস্টিক লাগানো মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে যায়। তার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে দোলা লেগে লেগে পড়ছিলো একটি মৃদু মনোহর গন্ধ সারা বাসে ছড়িয়ে পড়ছিলো। বাস থেকে সে নেমে যাওয়ায় সেটুকুও অন্তর্হিত হলো। সন্ধ্যায় অন্ধকার যেন গোধূলি লগ্নের মৃদু আরক্তিমতাকে গ্রাস করলো। অন্ততঃ পেছনের ঐ দু'জন যুবকের মনে তা-ই হয়েছিল। তাদের চোখের সামনে অন্ধকার নেবে আসে কিছুক্ষণের জন্য।

কিন্তু অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা আত্মস্থ হলো। যে যুবকটি কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে টিকিট নিয়েছিলো তার মনে পড়লো তেরো আনা পয়সা ফেরৎ নেওয়ার হয়নি। রিক্তপকেট। জীবনে এধরনের ভুল তো বড একটা হবার কথা নয়। সৌন্দর্য-রসপিপাসা লোপ পেয়ে গেলো টাকার কথা মনে পড়ে। যুবসুলভ মোহ ভঙ্গে নীতিজ্ঞান বেশী করে হঠাৎ দেখা দেয়। জীবনে ভালোটা হারিয়ে গেলে খারাপটা শূন্য জায়গা পূরণ করতে আসে। হায় লিপস্টিক-লিপ্তা তন্বী! তুমি বাস থেকে না নামলে কি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতো? কেন তুমি অনন্ত কালের জন্য এই বাসে আস্তানা গাড়লে না?

'আরে ও মিঞা, মনের আনন্দ খুব খোশগল্প লিখে যাচ্ছো। আমি তোমার ঐ যুবতীকে খুব ভালভাবেই চিনি। ওর নাম লেমুটাফিটা নয়। আসলে ওর নাম হচ্ছে জোজাফাইন কাকরীটা। এ বান্দরে থাকে। ওর বাবা বে-আইনীভাবে মদ বানিয়ে ব্ল্যাকে বিক্রী করে। দু' দু'বার জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছে। এই মেয়েটি একটি বাচ্চাকে জঠরে অক্কা পাইয়ে দিয়েছে। এর প্রেমিক একুনে অন্ততঃ এক ডজন। পপুলার ড্যান্সিং হলে নাচে। ধনী শেঠনন্দনদের নিজের জালে ফেলে নেয়। সব সময় মদ খায় আর তুমি শুঁকছ সে গন্ধ, তুমি বলছো তার নাবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যাস্ত হয়েছে। দুনিয়ার কতটুকু খবর রাখো হে? না কি রেখেও এড়িয়ে গিয়ে ন্যাকামো মার্কা গল্প লেখা তোমার অভ্যেস।

আরে—রে-রে-রে! তুমি আবার কোত্থেকে দেখা দিলে? এমন সুন্দর গল্প ফেঁদেছিলাম, দিলে তো সব মাটি করে! কে বলেছিল তোমাকে এ ব্যাপারে নাক গলাতে? উল্লুক কোথাকার! গেট আউট এখান থেকে!'

পেছনের সীটে-বসা যুবকদের মধ্যে মোতি নামক যুবকটি পকেটে হাত দিয়ে বন্ধুকে বলে, "গুলছন, তুমি কি কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে বাকি পয়সা ফেরৎ নিয়েছো ?"

গুলছন নিজের পকেট হাতড়ে বলে, "না তো।"

"ঠিক মনে আছে তো ?"

"মনে না থাকার কি আছে ? আমি তো এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। ভাগ্যিস এখন মনে পড়ল। নাহলে পয়সাগুলো যেতো। ওহে, ও কণ্ডাক্টর, এই যে, এই দিকে।"

এই সময়ে পাঁচ ছ'জন কণ্ডাক্টর নিজেদের ডিউটি শেষ করে ফিরছিলো ঐ বাসেই। নিজেদের সুখদুঃখের কথা নিয়ে তারা জমে গিয়েছিলো। শাহানপুরের কণ্ডাক্টরকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। তার মার অসুখ। তিন চার দিন ধরে নাকি লোকটা অন্ততঃ একদিনের ছুটি চাইছিলো মাকে দেখাশুনা করার জন্য। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করেছে একটা ওষুধ, ওষুধটা আবার বেশ দামী। কিন্তু কেনার মত পয়সা নেই। এদিকে ডাক্তার বলে দিয়েছে সাত দিন নাকি ওটা চালিয়ে যেতে হবে। মাসে যা আয় হয় তাতে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। মাসের শেষ এখন তার পকেটও গড়ের মাঠ। গরীবদের পকেট প্রত্যেক মাসেই শূন্য থাকে ; আর অর্থহীনতা তো মৃত্যুরই সমান। জীবনে একবার মৃত্যু ঘটলে তার গাম্ভীর্য থাকে, কিন্তু প্রত্যেক মাসে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কাছে তো সেটা বিলাসের সামিল। সে মৃত্যু হাসির খোরাক যোগায়। এদের দাবি কমপক্ষে একশত টাকা মাইনে। এদের অনেকেই ইউনিয়নে সামিল হয়েছে। আবার কেউ হবে আগামী দিনে।

আরো কত কি কথা তাদের মধ্যে চলে। আমার কাছে সেগুলি বিরক্তিকর। এরা কী ধরনের মানুষ ! হাড়ির কথা বাসের মধ্যে টেনে আনে। এদের মালিকরা নাকি খুব বজ্জাত। যত খাটে আরো খাটাতে চায়। বাসের কণ্ডাক্টরটিও ওদের কথবার্তাতে সামান্য যোগ দেয়। জানায় তার বাড়ীতেও অসুখ-বিসুখ। কালরাত্রে ঔষধ নিয়ে যেতে পারেনি। আজ এক টাকা পাঁচ আনা আছে পকেটে।

যাবার সময় ওষুধ নিয়ে যাবে। রোগীকে মড়া দেখবে কি জ্যান্ত দেখবে ঠিক নেই। কণ্ডাক্টরের চোখ ছলছল করে।

"ওহে, ও কণ্ডাক্টর," মোতি নিজের সীট থেকে আবার চিৎকার করে ওঠে।

"ওহে, ও দাদা, এই যে এদিকে আসুন না।"

"কী!"

"একটা টাকা দিয়েছিলাম। ছ'পয়সার দুটো টিকেট দিলেন। কই বাকি তেরো আনা তো দিলেন না।"

"আপনার তেরো আনা দিইনি?" কণ্ডাক্টর পরিশ্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

"না দেননি। সে সময়ে খুব ভীড় ছিল। টিকিট দিয়ে খুচরো পরে দেব বলে ওদিকে চলে গেলেন। পাঁচ সাতটা স্টপেজ অল রেডি চলে গেছে। এখন দিন।"

কিন্তু কণ্ডাক্টারের মনে আছে, তেরো আনা পয়সা ফেরৎ দিয়েছে। তবে এদের দেয়নি, অন্য কাউকে কি ভুলে দিয়ে ফেলেছে? কিছুতেই মনে পড়ে না কাকে তেরো আনা পয়সা দিয়েছে।

সে বললো, "আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে পয়সা আমি দিয়ে দিয়েছি।" বলে গুলছনের দিকে তর্জনি দেখায়।

গুলছন সজোরে মাথা নেড়ে বলে, "না। পয়সা আমাকে দেন নি।"

"তা হলে আপনার বন্ধুকে দিয়েছি। আমার খুব ভালোভাবেই মনে আছে। আমি দিয়েছি।"

"আপনি আমাকেও দেন নি।" মোতি খুব রাগের সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে।

কথার ফাঁকে আর একজন কণ্ডাক্টর নাক গলায়, "অতো ঝঞ্ঝাটের কী দরকার? আপনারা একটু পকেট হাতড়ে দেখে নিন না।" কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোতি আর গুলছন দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ে। পকেট বের করে দেখিয়ে দেয়। পকেট একেবারে খালি। গুলছন উদাসভাবে বলে, "আমরা নওবাহার স্টুডিওতে যাবার টিকিট কেটেছিলাম। পকেটে মাত্র এক টাকাই ছিল।" কথাটি বলেই দুজনে থপ্ করে বসে পড়ে সীটে।

বিরাট সমাবেশের মধ্যে কেউ যেন তাদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

অমন সুন্দর সেজেগুজে থাকা যুবকদের পকেটে মাত্র এক টাকা! তারা দুজনেই চালচলনে একেবারে পুরা নওজোয়ান। ফিল্ম এক্টর। দুজনেরই পোশাক পরিচ্ছন্ন। বেশ আঁটসাট। দুজনই দেখতে শুনতে শিক্ষিত। আর তাদের পকেটে কিনা মাত্র এক টাকা ছিল! আর তাও এত লোকের মধ্যে চিৎকার করে বলতে হলো! শত খানেক হলে, এক হাজার টাকা হলে, কিংবা লাখ টাকা থাকলে কি আর মাত্র তেরো আনার জন্য অতলোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে পকেট উলটিয়ে দেখাতো। আর ঐ ক'টা পয়সার জন্য কণ্ডাক্টারের সঙ্গে তর্কবিতর্কে মাততো। কিন্তু আজ তারা নিরুপায়। মাত্র এক টাকাই ছিলো পকেটে, তাই দিয়ে দুজনকে সারারাত বসে থাকতে হবে নওবাহার স্টুডিওতে। একটা ক্রাউড সিনে তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। এবং এই এক টাকাতেই তাদের দুজনের চা, পান, সিগারেট আর বাস ভাড়া চালাতে হবে। ঐ তেরো আনা থেকে এক পাই ছাড়লে তাদের চলবে না।

"কিন্তু আমি তেরো আনা আপনাদের দিয়ে দিয়েছি!" বাস কণ্ডাক্টর বলে,

"কাকে দিয়েছো?" গুলছন চটে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে।

বাস-কণ্ডাক্টর এদিক ওদিক তাকায় অসহায়ভাবে। কাকে আর কি বলবে।

আমি আড়চোখে অনেকক্ষণ ধরে পাশের ঐ লোকটির দিকে তাকাচ্ছিলাম। সে নিজের পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঠায় বসেছিল। এদিক ওদিক কোনো দিকেই তার দৃষ্টি নেই। নির্বিকার, নির্বাক, নিশ্চুপ। যেন এসব ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার ঘেমে-যাওয়া কপালটা আরও ঘেমে গেছে। তার তোবড়ানো মুখটা যেন আরও লম্বা দেখাচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাস চলছে খুব দ্রুত। তার কোটরস্থ চোখ দুটো যেন বলছে—পকেটে ঢোকানো হাতের মুঠোয় থাকা ঐ তেরো আনা তার জীবন। সাত সমুদ্দর তেরো নদী পারের রাজকন্যা যেন ওর মনের একই সুতোয় বাঁধা। শুধু তেরো আনাই নয়, জীবনের তেরোটি দিন। তেরোটা মাস। তেরোটা বছর। জীবনের তেরোটা শতাব্দী। ঐ তেরো আনাই তার কাছে সব কিছু। সেই পয়সাকে সে যেন কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। কিছুতেই দেবে না।

আমার মনে হয় যেন তার মুঠোটা পকেটের ভেতরে থেকেই একেবারে ঘেমে ভিজে গেছে। তার মুঠোটা যেন ঐ তেরো আনাকে রাখার জন্য এমনভাবে আছে, যেন আমৃত্যু সে ওটাকে ঐভাবে রাখতে কৃতসংকল্প।

বাস-কণ্ডাক্টর বলে, "আমি কোত্থেকে দেবো? আমিতো দিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে এমনিতেই পয়সা-কড়ি নেই। আমি এখন আর কোত্থেকে দেবো।" ওর মনে পড়লো ওষুধের জন্য রাখা এক টাকা পাঁচ আনার কথা। মনে পড়তেই সে চটে লাল হয়ে গেলো। গুলছন আর মোতির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "আপনারা পয়সা কোথাও ফেলে দিয়ে আমার ওপর চোটপাট দেখাচ্ছেন।"

"নাহে, ফেলে দিইনি বরং বল বাসের বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছি।" মোতি শ্লেষের চাবুক মেরে বলে, "নাও, আর পায়তারা না কষে আমার তেরো আনা পয়সা দাও। যথেষ্ট খেল দেখালে।"

ওষুধ তাহলে কি দিয়ে আনবো। দিলে কি আর থাকবে—কণ্ডাক্টর মনে মনে চিন্তা করে প্রায় কেঁদে ওঠে।

যুবক দু'টি ভাবছে—সারারাত শুটিংয়ে বসে থাকতে হবে। এক্সট্রা সাপ্লায়ারের গালমন্দ খেতে হবে। ডাইরেক্টারের ভ্রূকুটি। এবং সর্বশেষে রাতজাগা আর ক্যান্টিনের বাসি চা, ডাল, লুচি তো আছেই। আর দু'একটি সিগারেট। কিন্তু তেরোটি আনা এখন ছেড়ে গেলে এসবের কোনোটাতো হবে না। উপরন্তু উপোসে রাত জাগতে হবে। আর পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে বাড়ী। তেরোটি আনী শুধু তেরোটি আনী নয়। আমাদের দু'জনের জীবনের সোনার কাঠি, আর তাই কিনা বলছে ফেলে দিয়েছি। তেরোটি আনী কোথায় যে আছে একবার যদি বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলতো—এই যে আমরা! আমরা তোমাদের। তোমরা আমাদের ফিরিয়ে নাও!

এই তেরোটি আনী বাস-কণ্ডাক্টরের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছে না। দু'জন যুবকও সেগুলি ছাড়তে চায় না।

শুধু তেরো আনা!

পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি, অজন্তা, ইলোরা, দানশীলতা, দয়া, ধর্ম, চিন্তা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, কথাকলি, ইসলামিক সংস্কৃতি আর আদর্শের সামাজিক সংস্কৃতি।

ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা!

সবকিছু ছাপিয়ে মাত্র তেরো আনা!

বাস-কণ্ডাক্টরের চেহারা পাংশু হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সে পকেট থেকে তেরোটি আনী বের করে এমনভাবে তাদের হাতে রাখে যেন সে তার মায়ের শেষ নিঃশ্বাস ফেলা দেখছে।

মোতি পয়সাগুলো তার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়েই নিজের পকেটে রেখে দেয়। আর তারপর মোতি ও গুলছন উদাসভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে বসে থাকে যেন বাসে তারা ছাড়া অন্য আর কেউ নেই।

আমার পাশের সেই রোগা পিলপিলে লোকটি খুব জোরে একবার প্রশ্বাস নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকে। তার মুখ একেবারে পাংশুটে দেখায়।

আমি তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সব দেখি। মন ঘৃণার ভরে যায়। এই লোকটাই চোর। এই সেই তেরো আনার চোর। অথচ পরিষ্কার ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে করলো চীৎকার করে বলি—তুমি চোর। আমার মুখের একটি কথা তাকে গ্রেফতার করানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কেন জানি না শত চেষ্টা করেও সেই কথাটি মুখ দিয়ে বার করতে পারলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম ওর পাশে।

এই ঘটনার পরে কেউ কোনো কথা বাসে বলাবলি করেনি। কণ্ডাক্টরও চুপচাপ ছিলো। ঐ যুবক দু'জন তো বটেই, অন্য যাত্রীরাও সামিল হলো এই নীরবতায়। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে কিছু না কিছু ভাবছে।

ইতিমধ্যে আন্ধেরীর স্টপেজ এসে যায়। সেই রোগা পিলপিলে লোকটি একটি হাত পায়জামার পকেটে ঢকিয়ে অন্য হাত দরজার কাছের লোহার রডটি ধরে ঝুপ করে নেবে সজোরে হাঁটতে শুরু করে। প্রায় ছোটারই সামিল। আমিও সেই স্টপেজে নেবে তার পিছু ধরি। বাস্তবিকপক্ষে আমার খুব ইচ্ছে করছিলো যে, লোকটিকে যেমন করে হোক বুঝিয়ে দিই যে তার অপকর্ম তো আমি দেখেছি। শুধু একটি বার তার দিকে তর্জনী দেখিয়ে 'চোর'—এই কথাটি বলার দারুণ ইচ্ছা আমার মনে প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় করছিলো।

সে খুব দ্রুত হেঁটে চৌমাথায় এসে একবার সবদিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে ছোলাওয়ালার কাছে। মুঠো-করা হাতটা একবার পকেট থেকে বের করে দু'আনা দিয়ে এক কাঁড়ি ছোলা কেনে। তারপরই মুঠো মুঠো ভেজা ছোলা মুখে পোরে

আর ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মত চিবোতে থাকে। চোখে মুখে একটা ভয়ঙ্কর ক্ষুধার চিহ্ন। ক্ষুধা আর ক্ষুধা !

ইতিমধ্যে আমি তার কাছে প্রায় ছুটেই পৌঁছে গেছি। নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করার অপূর্ব সুযোগ ! তার সামনে দাঁড়াই। কিছু বলার উপক্রম করতেই সে আমার দিকে চেয়ে মুখ ভর্তি ছোলাসুদ্ধ হো হো করে হেসে তার শীর্ণ লম্বা তর্জনীটি উঁচিয়ে বলিষ্ঠতার সঙ্গে চীৎকার করে বলে—চোর !

সৈনিক

টি. শিবশঙ্কর পিল্লাই

বিরাট সাইনবোর্ড টাঙানো সৈন্য-রিক্রুটিং অফিসের সামনে বিরাট এক ভীড়। চাকুরিপ্রার্থীদের ভীড়। সেও ঐ চাকুরিপ্রার্থীদের সারিতে দাঁড়িয়েছিলো।

সে কত লম্বা, কত মোটা সবকিছুরই হিসেব নিকেশ নেওয়া হলো। বাপের নাম, বাড়ীর ঠিকানা—মাত্র এ ত্বটোর উত্তর সে দিতে পারলো না। সেই কয়েকশো লোকের মধ্যে তার এই কাণ্ড দেখে সবারই একটা চমক লাগলো। তবু তাকে ভর্তি করা হলো।

সেদিনই তাদের নিয়ে যাওয়া হলো অনেক দূরে। এগাড়ী ওগাড়ী করে আট দিন পরে তাদের নামিয়ে দেওয়া হলো এক জায়গায়।

ট্রেনিং-এর সময় তাদের অনেক ত্বঃখ পোহাতে হয়েছে। কিন্তু পেট ভরে খেতে পাওয়ায় তার সে ত্বঃখ বোধ হতো না। শুধু তাই নয়, জীবনের বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতাও তার বাড়তে লাগলো। এখন সে আর ভিখিরী নয়। সে আজ আত্মনির্ভরশীল। তার আছে নিজের বিছানা, নিজের বালিশ। করবার মত আছে তার কাজ, আর বাঁচবার মত আছে তার তাগিদ।

সেখান থেকে তাদের দলকে আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কিছুদিন পরে সেখান থেকে আর একটা শিবিরে। তারপর আরও কয়েকটি। এইভাবে কেটে গেলো বছরের পর বছর।

একদিন কর্তৃপক্ষ একমাসের ছুটিতে তাদের যে যার দেশে যেতে হুকুক দিলেন। সেদিন শিবিরের প্রত্যেকটি সৈনিকের মনে উঠে আনন্দের ঢেউ। তাদের প্রত্যেকেই আপনজনের ডাকে দিতে পারবে প্রাণের সাড়া। গাঁয়ে ফেলে-আসা সোনালী সূর্যের উদয়াস্তের মনোরম দৃশ্যের জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই লোকটির মনে যেন কোনো উৎসাহ নেই। নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। সে কোথায় যাবে? পৃথিবীতে তার কেই বা আছে? সাগ্রহে অপেক্ষা করবার মা-ই নেই, আর বউ-ছেলেমেয়ের কথা তো স্বপ্নেরও অতীত।

কে একজন তার নাম রেখেছিলো 'রামন', আর তার সঙ্গে 'নায়ার'-টাকে যে কে জুড়ে দিয়েছিলো, তা সে জানে না।

পরের দিন ভোরে সকলের আগেই ঘুম থেকে উঠলো। বাক্স ও বিছানাপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সকলের আগে।

আলপুষার* পথেঘাটে বস্তী-গলিতে দু'চারদিন লোকে দেখলো একজন সৈনিককে ঘোরাফেরা করতে। রাত্রেও ঘুরতো সে। সে যে কে, কোথাকার লোক বা কোথায় থাকে, কেউ জানে না। তারপর সে যেন কোথায় মিলিয়ে গেলো।

আর একটি শহর কোল্লমের এক গলিতে একটি বাড়ীর সামনে একজন সৈনিককে দেখে একটা বাচ্চা মেয়ে ভয়ে কেঁদে উঠলো। সে বুঝতে পারলো ওস্থান তার নয়।

এইভাবে কেটে যায় মাসের কুড়িটি দিন। মিললো না তার কোনো স্বজনের সাক্ষাৎ। সে জানে না, আত্মীয়রা কোথায়, আর কারাই বা তার আত্মীয়।

উন্নত শহর থেকে দূরের একটি গ্রাম।

পাহাড়ের তলায়, ক্ষেতের কাছে, সবুজ বনানীর আবেষ্টনীর মধ্যে একটি ছোট ঘরের বারান্দায় বসে একজন সৈনিক খাওয়া দাওয়া করছে। একটি বৃদ্ধা তাকে খাওয়াচ্ছে খুব আদর-যত্ন করে। বৃদ্ধাকে সে ডাকলো 'আম্মা' বলে, আর বৃদ্ধাও তাকে ছেলের মত আদর যত্ন করলো।

দু'জনেই ঘরোয়া কথায় মেতে গেলো। মা বলে,—"চার-পাঁচজনের সংসার বাবা, এতেই চলে। ক্ষেত-খামার না দেখলে উপোসে মরতে হয়।··· ··· এ কি! আর কটা ভাত খাওনা, বাবা!"

*কেরালার একটি শহর।

"না মা, বেজায় খেয়েছি। প্রায় সের খানেক চালের ভাত খেয়ে ফেলেছি।"

"না রে বাবা, মাত্র দু'তিন মুঠো ভাত খেয়েছো।"

"আচ্ছা মা, তোমার কোনো ছেলে নেই?"

বৃদ্ধার চোখে জল এলো—"ভগবান একটা দিয়েছিলো, বাবা, কিন্তু বছর কয়েক পরেই তা ফিরিয়ে নিলো। বেঁচে থাকলে আজ তেইশ বছর, সাত মাস, চার দিনের হতো।...ওকি! হাত ধুয়ে ফেলছো যে, আর ক'টা ভাত খাও বাবা।"

"না মা, আর খেলে পেট ফেটে যাবে।"

জীবনে সে এই প্রথম একজনকে পেলো যে বলেছে, "আর একমুঠো ভাত খাও না বাবা!"

পরের দিন ভোরে সে বৃদ্ধাকে বললো, "মা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।"

"বলো বাবা।"

"আমার নিজের বলতে সংসারে কেউ নেই।"

"হ্যাঁ, তা তো তুমি কালকে বলেছিলে।"

"পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে একটা কুঁড়ে ঘরও নেই, মা।"

"তুমি তো কালকে বলেছো। ওসব কথা সবসময় মনে করে মনের দুঃখ বাড়িয়ো না।"

"আমার যে একেবারেই কেউ নেই মা।"—বলেই গভীর বেদনায় কেঁদে উঠলো। সমবেদনায় সহৃদয়তায় গলে বৃদ্ধা তাকে কোলে তুলে নিলো।

সেদিনই দুপুরে বৃদ্ধার বাড়ীর উঠোনে ছাদনা-তলায় বৃদ্ধার মেয়ে নানীর সঙ্গে রামন নায়ারের বিয়ে হয়ে গেলো।

সেদিনের গোধুলি বেলায় রামন সস্ত্রীক হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে তাদের মিলিত জীবনে অনুভব করলো অস্তগামী দিনমণির সোনালী কিরণস্পর্শ। পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাঠ এমনকি প্রতিটি গৃহ আজ তাদের কাছে মানবিক হৃদয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

অসীম আকাশের সুদূর তারারাও যেন মিটমিট করে দরদী চোখের পলক ফেলে দেখতে থাকে এই দু'টি মানব-মূর্তিকে।

"আজকে না গেলেই কি নয়? আজ থেকে যাও। কাল যেয়ো।" রামন ঘুরে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, তারই স্ত্রী নানী তাকে ডাকছে। নানী তার স্ত্রী, সে তার স্বামী।

"না নানী, আজকে না গেলে ঠিক সময় পৌছুতে পারবো না। কয়েক দিন পরেই ছুটি নিয়ে আবার আসছি। তুমি চিন্তা করো না লক্ষ্মীটি।"

"আমি পথ চেয়ে থাকবো,—এসো।"

রামন শেসবারের মত নানীর দিকে চেয়ে এগিয়ে গেলো।

সেই বাড়ীর ঠিকানায় প্রত্যেক মাসে পারিবারিক ভাতা আসতো। ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনা হলো। ভাঙা ঘর মেরামত করা হলো। বৃদ্ধা প্রত্যেকদিন মন্দিরে যেতো, আর মেয়ে-জামাইয়ের সুখী জীবন কামনা করতো।

কয়েকমাস পর থেকে প্রত্যেকদিন নানী তার স্বামীর খাবার রেখে সকাল থেকে পথ চেয়ে থাকতো—এই বুঝি কেউ ডাক দেবে, সে ছুটে যাবে, দরজা খুলবে।

"তোর স্বামী আবার কবে আসবে লো?" বান্ধবীদের প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারতো না।

একদিন পিওন একটা মোটা খাম দিয়ে যায় নানীর হাতে। তাতে একজন সৈনিকের একটা ফটো। নানী সে ফটো বাঁধিয়ে দরজার উপর টাঙিয়ে রাখে।

তিনমাস পরেই নানী তার মাসিক ভাতাটা হঠাৎ কিছুটা বেশী পায়। দু'মাস পরে তা আরও বাড়ে।

অন্য একদিন থানা থেকে নানীকে ডেকে পাঠালো তিনটি ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে। নানী থানায় গেলো। তিনটি ট্রাঙ্কই বেশ বড়, তার একটিতে ছিলো একজন সৈনিকের ইউনিফর্ম। অন্য একটি ট্রাঙ্কের ভিতরে ফেরৎ পাওয়া গেলো বিয়ের সময়ের ফুলের মালাটি শুকনো অবস্থায়। নানী দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল পাথরের মত।

এক হপ্তা পরে নানীর নামে আসে এক হাজার টাকার একটি চেক। তারপর ....আর কোনোদিন কিছু আসে নি।

হিন্দী

অন্তরালে

যশপাল

চৌধুরী পীরবক্সের ঠাকুরদা দারোগা ছিলেন। রোজগার করতেন ভালোই চাকুরি-জীবনেই ছোট্ট একটি পাকাবাড়ী তৈরি করে নেন। দু'টি ছেলেকেই ম্যাট্রিক পাস করিয়ে একজনকে রেলের, অন্যকে ডাকঘরের কাজ পাইয়ে দিলেন। ছেলেদের বিয়ে-থা হলো, নাতিপুতির মুখ দেখার সৌভাগ্যও বাদ পড়লো না। কিন্তু চাকুরিতে ছেলেরা তেমন সুবিধে করতে পারলো না। ভবিষ্যতের আশা নিয়েই তাঁকে চোখ বুজতে হলো।

বাড়ীটা ছোট্ট হলেও বংশমর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে চৌধুরী ওটাকেই 'বড়বাড়ী' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে মেয়েরা থাকতো বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যে; পুরুষেরা আড্ডা জমাতো রাস্তার ধারের বৈঠকখানায়। নামকরণ গালভরা হলেও বাজে বৈঠকীতেই দিন গুজরান হতো তাদের। কাজেই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর ক্রমবর্ধমান সংসারের স্থান সংকুলানের জন্য সদর দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে বৈঠকখানাটাকেও অন্দরের সামিল করে নিতে হলো। বৈঠকখানা না থাকলেও ঠাঁট বজায় রাখার দরুণ প্রয়াস!

ক্রমে স্থানাভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দিলো। সুতরাং সুবিধামত এদিক-ওদিক ছড়িয়ে না পড়ে আর উপায় রইলো না।

চৌধুরী সাহেবের ছোট ছেলে ইলাহীবক্সের চারটি ছেলের মধ্যে তিনটি মোটামুটি লেখাপড়া শিখে নিজেদের পছন্দসই কাজকর্ম জুটিয়ে নিলো। ছোট ছেলে পীরবক্স কিন্তু প্রাইমারীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলো না। তা'হলেও ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। এবং শীগগিরই মা ষষ্ঠীর কৃপায় বা

আল্লার দোয়ায় অনেকগুলি রেজগীতে ভরে উঠলো ঘর। বংশমর্যাদার উপযুক্ত উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হলো। মর্যাদা মাফিক কাজ যখন জুটলো না তখন অগত্যা একটা তেল-কলের চাকুরিতেই যোগ দিতে হলো। একাজের উপযুক্ত সে ছিলো না, তবু বংশমর্যাদার তকমাটার জোর ছিলো, তাই মজুরীগিরির বদলে কলম পেষার কাজই জুটলো। মুন্সিগিরি। মাইনে মাসে বারো টাকা।

আয়ের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা স্যাঁতস্যাঁতে বস্তিতেই তাকে ঘর নিতে হলো; ভাড়া মাসে দু'টাকা। আশেপাশে মুচী, মেথর, কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরা ঘাঁটা লোকদের বাস। সামনেই রমজানী ধোপানী। ভাঁটিখানার ধোঁয়ায় জায়গাটা অন্ধকার করে থাকে। সোডার গন্ধে ঘরে টেকা দায়। গলিটার মুখেই জলের কল থেকে চুঁইয়ে-পড়া জলধারা কাঁচা গলিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে বরাবর কালো হয়ে সর্বক্ষণ বয়ে যায়। তারই দু'পাশ দিয়ে ঘাস গজিয়ে উঠেছে পুরু হয়ে। রাজ্যের মশা আর মাছির ভনভন আওয়াজ সবক্ষণ আলোবাতাসহীন গলিটার মিশকালো অন্ধকারকে জড়িয়ে থাকে।

বস্তিতে পীরবক্সের মত লোকেরও লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে খাতির ছিলো। আর তার একমাত্র নিদর্শন ছিলো দরজায় ঝোলানো দামী পর্দাটা। বাড়ীর ভেতরে যাই ঘটুক না কেন, শত আল্পী-দেওয়া দামী পর্দা যেমনকার তেমনি ঝুলতো। বস্তির লোকদের কাছে পীরবক্স তাই ছিল চৌধুরী সা'হেব বা মুন্সিজী। তার বাড়ীর মেয়েরা ছিল অসূর্যম্পশ্যা—কেউ কোনোদিন তাদের বাড়ীর বা'র হতে দেখেনি।

দিন কেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু সময়ের গুণে দেউড়ির নড়বড়ে দরজাটা খসতে খসতে একদিন রাত্রে একেবারে ভেঙে পড়ে গেলো। পীরবক্স নিজেই সেরাত্রে কোনোক্রমে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু সারারাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটলো – কি জানি যদি চোর আসে! কিন্তু চোর এলো না। বাইরের লোকে অবস্থাপন্ন জানলেও চোরের নেবার মত কিছুই পীরবক্সের ঘরে ছিলো না।

অবশ্য চোরের চেয়ে পর্দার সমস্যাটাই ছিলো বেশী। কারণ দরজা না থাকলে পর্দা টাঙানো ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু পুরনো জীর্ণ পর্দাটা একদিন ঝড়ের

রাত্রে এমনি ফালা ফালা হয়ে গেলো যে খাটাবার আর উপায় রইলো না। বাধ্য হয়ে ঘরের শেস সম্বল দামী শতরঞ্জটাই টাঙিয়ে দিতে হলো।

পাড়ার লোকে দেখে বলল, "চৌধুরী সাহেব, এমন দামী জিনিস আজকালের দিনে কেউ নষ্ট করে? সস্তা চাদর ঝুলিয়ে দিন না!"

পীরবক্সের জানা ছিল আট আনার কমে দু'গজ কাপড় পাওয়া শক্ত। হেসে বললে, "তাতে আর হয়েছে কি? আমাদের বড় বাড়ীতেও তো এই ধরণের পর্দাই বরাবর খাটানো হয়।"

পনেরো বছরে পীরবক্সের মাইনে বারো থেকে বেড়ে হলো আঠার টাকা। কিন্তু আল্লার কৃপায় সন্তান হলো ছেলেমেয়ে মিলিয়ে প্রায় আধডজন। তার উপর পিতার মৃত্যুর পর ভাইরা কেউ দায়িত্ব না নেওয়ায় মা তারই কাছে পড়ে রইলেন।

সংসারে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এবং অসুখবিসুখ লেগেই থাকে। বাড়ীর পাঁচজন মেয়েমানুষের কাপড় জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে গা থেকে খসে খসে পড়ে, পীরবক্সের নিজের পায়জামা আর পাঞ্জাবিও শালীনতা রক্ষা করে চলার অনুপযুক্ত। কিন্তু কোনোক্রমেই কোনো কিনারা সে করে উঠতে পারলো না। চারদিকে অকূল পাথার। কারখানা থেকে সাত তারিখের আগে বেতন মিলবে না। এডভান্স মালিক দিতে নারাজ। জিনিস বন্ধক দিয়ে টাকায় বারো আনা সুদে ধার কখনও কখনও সে নিয়েছে। কিন্তু তার উপায় ছিল না। কাজেই কাবুলীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথই বা কি! বাবর খাঁর কাছে থেকে আগেও দু'একবার সে টাকা ধার নিয়েছে। এবারেও তারই কাছে ধর্ণা দিতে হলো। মাসিক টাকায় চার আনা সুদে চার টাকা ধার নিলো। আট মাসে ঋণ পরিশোধ করার চুক্তি হলো।

বাবর খাঁয়ের কিস্তি মেটাতে না পারলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করে পীরবক্সের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাতটা মাস মরি-বাঁচি করে সে কিস্তি শোধ করলো। কিন্তু শ্রাবণের ভরা বর্ষায় গম তো দূরের কথা বাজরাও যখন টাকায় তিনসের হলো তখন আবার ধার না করে পেরে উঠলো না। খাঁ সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে, দেড়া সুদ দিতে রাজী হয়ে আরো এক মাস সময় নিলো। কিন্তু ভাদ্র মাসে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠলো। মাগগি ভাতা নিয়ে বিশ টাকা বেতনের

মধ্যে অগ্রিম নেওয়ার দরুণ মাত্র চারটি টাকা তার হাতে এসেছে। এদিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, তার পথ্য পর্যন্ত জুটছে না; ছেলেমেয়েগুলো সারা সপ্তাহটা প্রায় উপোস দিয়েই কাটিয়েছে। কোনোদিন দু'চার পয়সার সস্তা খাবার, নয়তো একবাটি করে বাজরা সেদ্ধ খেয়ে গুষ্টিসুদ্ধ কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট করে চার টাকা থেকে দেড় টাকা কেটে বাবর খাঁয়ের হাতে তুলে দেওয়া পীরবক্সের পক্ষে সম্ভব হলো না।

কাজেই পীরবক্সের কাছে বাবর খাঁ একটা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রইলো। ওর কথা মনে হলেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

"চৌধুরী!" তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলো পীরবক্স; শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো গলাটা, হাত-পাগুলো এলিয়ে পড়লো। কিন্তু গলা চড়িয়ে চৌদ্দপুরুষের নাম ধরে যখন গালাগালি করতে করতে পর্দা ঠেলাঠেলি শুরু করলো বাবর খাঁ, নির্জীবতা সত্ত্বেও তখন বেরিয়ে এসে সে তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। মুহূর্তের জন্য তার অভিজাত রক্ত গরম হয়ে উঠে তখনই আবার শান্ত হয়ে গেলো। খাঁয়ের পা ধরে সেদিনকার মত মাপ চাইলো।

ক্রুদ্ধ বাবর খাঁ তখন অগ্নিশর্মা। তার চিৎকারে চৌধুরীর দরজার সামনের বস্তির যত মুচি আর মজুরদের ভীড় জমে গেলো। উত্তেজিতভাবে লাঠি ঠুকে বাবর চীৎকার করে বললে, "টাকা দিতে পারবিনা তো কেন নিয়েছিলি বদমাস্! তোর মাইনের টাকা কি করেছিস্? বদমাস্, আমার পয়সা মারবি ·····আজ তোর চামড়া না ছাড়িয়ে নিয়েছি তো······পয়সা নেই, আবার পর্দা, নবাবী চাল মারিস। দে, তোর বউয়ের গয়না খুলে দে, নিয়ে আয় ঘরের বাসন যা আছে; নিয়ে আয়, আমি তাই নিয়ে যাবো। শুধু হাতে আজ কিছুতেই ফিরবো না।"

নিরুপায় এবং হতবুদ্ধি পীরবক্স দু'হাত তুলে বাবর খাঁয়ের কল্যাণ কামনা করে বললো, "শপথ করছি, বিশ্বাস কর, ঘরে একটা কানাকড়িও নেই, বাসনপত্র, কাপড়চোপড় কিছু নেই। এরপরেও যদি কিছু চাও আমার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বাজারে বিক্রী করোগে।"

বাবর খাঁ জ্বলে উঠলো, "রেখে দে তোর শপথ, ওতে আমার কাজ নেই। আর তোর চামড়াই বা আমার কি কাজে লাগবে, ওতে তো জুতোও বানানো যাবে না?

তোর চামড়ার চেয়ে এই পর্দাটারও দাম বেশী”, বলতে বলতেই টাঙানো পর্দাটা বাবর খাঁ এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো। দরজার সামনে থেকে পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীর জীবনশিকড়ও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কাটা গাছের মত সংজ্ঞাহীন হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পর্দাহীন দরজার ভিতর দিয়ে তাকাবার মত মনোবল চৌধুরীর ছিলো না। এ পাশে সংঘটিত ঘটনার উত্তেজনা ও আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মেয়েরা উঠোনের মাঝখানে জড়ো হয়ে বলির পাঁঠার মত থরথর করে কাঁপছিলো। সহসা পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তারা এমনি সংকুচিত হয়ে উঠলো যে দরজার মুখে ভীড় করে দাঁড়ানো জনতার মনে হলো তাদের পরনের শাড়ীকাপড়গুলো কে যেন অকস্মাৎ তাদের গা থেকে একটানে ছিনিয়ে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে পর্দাটাই ছিলো বাড়ীর সমস্ত মেয়েদের আবরু। পর্দা না থাকলে তারা প্রায় বিবস্ত্র ও উলঙ্গ!

জটলা পাকিয়ে-থাকা আশেপাশের মুচি, মেথর, ধোপা, কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরা-ঘাটা লেখাপড়া না-জানা লোকগুলো ঘৃণা আর লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। হঠাৎ এই নগ্ন চেহারাগুলো যেন বাবর খাঁয়ের কঠোরতাকে পর্যন্ত চাবুক মারলো। ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে থু-থু করে পর্দাটা উঠানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটা দুর্বোধ্য শপথ উচ্চারণ করলো সে। তারপর নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে ভীড়ের সামনে থেকে আড়ালে মেয়েদের ছুঁটে পালাতে দেখে লজ্জা আর কেমন যেন এক অব্যক্ত করুণায় জনতা ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো। চৌধুরী বেহুঁস হয়ে পড়েই রইলো, যেন ঘুমুচ্ছে। যখন হুঁস হলো দেখলো পর্দাটা তারই সামনে উঠোনের উপর গুটিয়ে জড়পিণ্ডের মত পড়ে রয়েছে। কিন্তু উঠে টাঙিয়ে দেবার মত উদ্যম তার শরীরে ছিলো না। তার প্রয়োজনও আর ছিলো না। যে ভুয়া আভিজাত্যকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রেখেছিলো ঐ পর্দা, তার মৃত্যু ঘটেছে!

আবার পকেট কাটা গেলো !

নওতেজ সিং

"ওহে, পথে আমাকে অনেক জায়গায় দাঁড়াতে হবে আবার, তাড়াও আছে খুব। ওহে এই রিক্সা, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো দেখি !" ধর্মবীরজী ছোটবড় অনেকগুলো পুঁটুলিপুঁটলা রাখতে রাখতে রিক্সাওয়ালাকে বলেন। "ভাল কথা, পরে আবার কোন ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করো না। নাও, দেখে নাও, আমার ঘড়িতে এখন পুরো দুটো। ঘন্টা হিসেবে আমি পয়সা দেবো।" এইসব দর কষাকষি করে ভদ্রলোক রিক্সায় বসে পড়লেন।

"আপনার যা ইচ্ছা বাবু। আমার পাওনা পয়সা কি আর আপনি মেরে দেবেন ?" এই কথা বলে রিক্সাওয়ালা প্যাডেলে পা টেপে।

"তবুও আগে কথা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া ভালো। সাধারণতঃ রিক্সাওয়ালা বড় ঝগড়ুটে হয়।···ওহে একটু জোরে পা চালাও। বড়বাজার থেকে বেরিয়ে কাতওয়ালীর দিকে।"

রিক্সাওয়ালাকে পথের নির্দেশ দিয়ে ধর্মবীরজী ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে পার্টির কথাই তাঁর চিন্তাভাবনা জুড়ে ছিলো। ছেলে রাজার জন্মদিন উপলক্ষে এই পার্টির আয়োজন। মিষ্টিতো পাশের বাড়ীর শাওজী বানিয়েই দেবেন। নোনতা খাবার আবার যাতে বেশী না হয়ে যায় নজর রাখতে হবে।···হ্যাঁ, কনেল সাহেব আর তার মেমসাহেব এসে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। ওরা আবার দেশী খাবার ভালোবাসে না। জন্মদিনের কেকের সঙ্গে বরং বিয়ার ইত্যাদি কিছু নিয়ে যাই। না হলে ওদের মন রক্ষা করা যাবে না। কিছু ফলও নিতেই হবে ! আর রাজার জন্য কিছু খেলনা নিতে ভুললেও চলবে না। এই যা, খোকারতো আর একটা ফরমাস ছিলো। জলছবি, জলছবি ব্যাটাচ্ছেলে বলতে পারে না, বলে কিনা 'তলছবি'।

"বাবু, আপনি কি জানেন ঠিক সময়ে মাইনে না দিলে স্কুলে নাম কেটে দেয় কিনা ?" রিক্সাওয়ালা চিন্তিতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করে।

ধর্মবীরজী তো অবাক। রিক্সাওয়ালা বলে কি ! স্কুল ! উত্তর দিতেই হবে। "না হে, নাম কাটা যায় না, জরিমানা দিতে হয়।"

"আজ ইংরেজী নয় তারিখ না দশ তারিখ বাবু ?"

'দশ' বলার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবীরজীর মনে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। কত সৌভাগ্যশালী এই দিনটা ! রাজা খোকার জন্মদিন।

'দশ'। রিক্সাওয়ালা আগেই জানতো। তবু কিছুক্ষণের জন্য চেয়েছিলো কেউ তাকে নয় বা দশ তারিখে গুলিয়ে দিক। তার বড় ছেলে সুন্দরের ফাঁস জমা দেওয়ার শেষদিন।

দিনটা যেন কি রকম। আজকেই দিতে হবে। সনাতন ধর্মস্কুলে পড়তো সে। কালকের রোজগার থেকে দু'টাকা রেখে দিয়েছে। ভাবলো আজকের রোজগার থেকে একটাকা বের করে নেবে। আর স্কুলের পথে যাত্রী পেলে একসঙ্গে তিনটাকা দিয়ে আসবে। কিন্তু আজকের দিনটা এত বিশ্রী যে বলার নয়।

"কালকের দু'টাকা আর আজকের রোজগারের টাকা সব খুইয়েছি।"

"সে কি, কোথায় খোয়ালে ?"

"পকেট মেরেছিলো।"

"চুপ চুপ, এতো খুব মারাত্মক অন্যায় হয়েছে। থাক, ভগবান বলে একজন আছেন। যে তোমার মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে পেটে লাথি মেরেছে তার সেটাকা কিছুতেই ফলবে না।"

"সে তো পরের কথা বাবু, এখন তো ছেলেটার নাম কাটা যাবে। স্কুলে পড়তে পারবে না।" রিক্সাওয়ালা প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে।

"আরে না, না, স্কুল বলে কথা। বিদ্যাদান ক্ষেত্র। এতে অন্যায় হবে না। নাম কাটবে না। তোমার তো দু'টাকা গেছে। দেখবে ভগবানও দু'টাকা তোমাকে ঠিক দিয়ে দেবে। ও নিয়ে তুমি বেশী চিন্তা করো না। হ্যাঁ—একটু জোরে চালাও দিকি। ঐ যে সামনের মোড়ের পাশে বিলিতি মিষ্টির দোকান আছে সেখানে একটু থামবে।"

কিছুক্ষণের পরেই রিক্সা থামলো। ধর্মবীরজী দোকানে ঢুকলেন। রিক্সা-ওয়ালা বাইরে রইলো দাঁড়িয়ে। দোকানটি এমন সুন্দরভাবে সাজানো। চমক লাগে। মনে হয় যেন বিয়েবাড়ী। কাঁচের ভেতর সারি সারি মিষ্টি সাজানো। কত মিষ্টি! কত রকমের!

পকেট কাটা যাওয়ার পর থেকেই মন খারাপ। এখনও এক কাপ চা খায়নি রিক্সাওয়ালা। ঘর থেকে সে শুকনো রুটি এনেছিলো, সেগুলোই এক ফাঁকে চিবিয়ে জল খেয়ে নিলো। কিন্তু তেষ্টা বেড়েই যাচ্ছিলো।

"বাবুজীতো ভেতরে খুব দেরী করবেন। একটু চা খেয়েনি এই ফাঁকে।" তারপর পকেটে হাত দিয়ে থেমে কাছের কলে আর একবার জল খায়।

জল খেয়ে এসে দেখে বিরাট দু'টো টিনের ড্রাম নিয়ে ধর্মবীরজী রিক্সায় বসে আছেন রক্তচক্ষু করে। সরোষে বলে উঠলেন, "দেখ, ঘণ্টা হিসাবে রিক্সা চালানোর কথা হয়েছে। তুমি তার সুযোগ নিয়ে তোমার মর্জিমত ঘুরে বেড়াবে, তা কিন্তু চলবে না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।"

"আমি কোথাও নিজের মর্জিমত ঘুরে বেড়াইনি বাবু। এই সামনের কলে দু'আঁজলা জল খেয়ে এসেছি মাত্র।"

"হয়েছে, হয়েছে, নাও, পা চালাও, আমার ওদিকে খুব তাড়া আছে।"

তারপর আর একবার রিক্সা থামলো খেলনার দোকানের সামনে। সে কি বিরাট সুসজ্জিত দোকান! কত রংবেরংয়ের আলো। ছোট ছোট মোটর গাড়ী কাঁচের ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করছে। আওয়াজটা যেন সত্যি মোটর গাড়ীর। রেল-লাইনের ইঞ্জিন কী সুন্দর ছোট ছোট বগি নিয়ে যাচ্ছে। ওমা এযে সিগন্যাল পড়ে গেছে! বাঃ! এযে ফুলের উপর প্রজাপতি বসে পাখা নাড়ছে!

"আরে এই রিক্সাওয়ালা, হা করে ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? ডিব্বা-গুলো রিক্সায় রাখো দেখি, এই ডিব্বাটা।"

ডিব্বাটা হাতে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে একটু নাড়তেই—ওমা একি গান গাইছে! আর একটু জোরে নাড়তেই ব্যস চুপ হয়ে গেল। ধর্মবীরজী আরো কিছু খেলনা নিয়ে উঠলেন রিক্সায়।

গেলো কিছু দূর। থামলো আবার ফলের দোকানের সামনে। নাবতেই ধর্মবীরজীকে ঘিরে ধরলো একদল ভিখিরি ছেলে। কিছুতেই ছাড়বে না। নাছোড়বান্দা। কিছু ভিক্ষা তাদের দিতেই হবে। "এই রিক্সাওয়ালা, ভাগাও এদের।" চিৎকার করে উঠেন ধর্মবীরজী।

রিক্সাওয়ালা রিক্সার কাছেই ঠায় বসে থেকে বলে, "না বাবু, দেরী হয়ে যাবে। ঘণ্টা হিসাবে আপনার ভাড়া খাটছি। আপনি আসুন।" ধর্মবীরজী রেগেমেগে দু'ঝুড়ি ফল নিয়ে রিক্সায় বসলেন।

"নাও, এবার খুব জোরে চালাও। অনেক সময় চুরি করেছো। ঘণ্টা হিসাবে ঠিক করাই ভুল হয়েছে। নাও, আরো জোরে চালাও—আরো জোরে।"

কিছুদূর রিক্সাটা খুব জোরে গেল। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। থামতেই ধর্মবীরজী ধরে নিলেন শয়তানটা ইচ্ছে করেই চেনটা নাবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরই তাঁর নজরে পড়লো, সামনে রেলগেট বন্ধ। ভাবনায় পড়লেন। যতক্ষণ গেট পড়ে থাকবে ততক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। রিক্সাওয়ালাও বসে থাকবে। ভাড়াও গুনতে হবে সেই সময়ের। আর একবার আফসোস করলেন। ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া না করলেই ভালো হত। ধর্মবীরজী ঘড়ি দেখলেন পুরো পনেরো মিনিট পরে গেট খুললো। পথে রিক্সাওয়ালা আর একবার সকালের পকেটকাটা যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গেলো। কিন্তু পেছন থেকে কোন সাড়া না পেয়ে থেমে গেলো।

রিক্সা করে দু'ঘণ্টার কিছু বেশী সময় হয়ে গেছলো। আর এখনো তাঁর বাড়ী কতদূরে! এখন যদি কথা বলে তো রিক্সাওয়ালা আবার আস্তে চালাবে। ব্যাটাদের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলাই ভুল। খুব আস্তে চালায়।

নিজের বাড়ীর একশ গজ দূরে ধর্মবীরজী ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে চারটে। দু'ঘণ্টায় দেড়টাকা। আর এই উপরি আধঘণ্টায় ছ' আনা তো দিতেই হবে। একটু কমাতে বললেই বাড়ীর সামনে গলাবাজী করবে। ছাড়বে না। হঠাৎ ধর্মবীরজী দেখলেন রিক্সাওয়ালা একমনে প্যাডেল চালাচ্ছে। তাকালেন নিজের সোনার ঘড়ির দিকে। তারপরই আস্তেআস্তে কাঁটাটি ঘুরিয়ে দিলেন পেছনের দিকে।

নিজের বাড়ীর বড় গেটের কাছেই রিক্সা থামিয়ে দিলেন, পাছে কিছু আমন্ত্রিতরা আগেভাগেই এসে গিয়ে ঘড়ি দেখে কিছু মন্তব্য করে বসেন। আর তা ছাড়া এই একগাদা জিনিস নিয়ে রিক্সায় চড়ে আসা তাদের চোখে খারাপ দেখাবে। আভিজাত্য বলে একটা কথা আছে তো! বড় ট্যাক্সি না হোক অন্ততঃ বেবী ট্যাক্সি করেও তো আসা উচিত ছিলো। সৌভাগ্য যে চাকরও বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সেসব জিনিষপত্তর নাবিয়ে নিলো।

"এই দেখো, চারটে বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকী আছে"—ধর্মবীরজী রিক্সাওয়ালাকে ঘড়ি দেখাতে দেখাতে বললেন। "ছ'টোব সময়ে তোমাকে ভাড়া করেছিলাম। যাক্‌, পাঁচ মিনিটের জন্য আর কিছু কাটলাম না। এই নাও, দুঘ'ণ্টার পুরো দেড় টাকা।"

"বাবুজী, আপনি আমাকে মিছিমিছি ঘড়ি দেখাচ্ছেন কেন? আপনি কি আর আমার হকের কড়িমেরে দেবেন?"—রিক্সাওয়ালা পয়সা নিতে নিতে বলে। তারপরেই তার মনে হলো সকালে পকেট কাটা না গেলে সে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ছেলেটার স্কুলের মাহিনা দিয়ে আসতে পারতো।

বেচারা, সে কি আর জানতে পারবে যে তাব পকেট এক্ষুণি আর একবার কাটা গেছে!

চাঁপাফুল

এন্. ব্যাসরায় বল্লাল

লেডী ডাক্তারের মুখে হাসির তরঙ্গ খেলে গেল।

"জেগে গেলে? কালকের মধ্যে সেরে উঠবে। ভয় নেই।" যশোদার উপর ঝুঁকে পড়ে সে বলে।

লেডী ডাক্তারের চুলের খোঁপায় চাঁপাফুলের মালা গাঁথা। তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলার সময় চাঁপাফুলের সুগন্ধের আভাস পেল যশোদা। মুহূর্তের জন্য যশোদার মনে উঁকি মারলো অতীতের সেইদিনগুলির কথা, যার মধ্যে হাসি ছিলো, আনন্দ ছিলো, মাধুরিমা ছিলো, আর ছিলো স্বর্গসুখের মাধুর্য।

কিন্তু সেদিন আর নেই—যশোদার 'উনি' আজ নেই। তার জীবনে এখন শুধু ব্যথা, বেদনা ও দুঃখ। মুখে সামান্য কৃত্রিম হাসি মাঝে মাঝে আনতে হয় দেবর প্রভাকর, শ্বশুর আর শাশুড়ীর জন্য। প্রভাকরকে সে ভালোবেসে ফেলেছে নিজের ভাইয়ের মতো।

'উনি' চলে যাওয়ার পর থেকে যশোদা তার জীবন থেকে হাসি, আনন্দ আর উচ্ছলতাকে সরিয়ে দিয়েছে। বিকেলে আর সে যায় না বেড়াতে, যায় না আর সিনেমায়। শাশুড়ী শতবার বলা সত্ত্বেও কোনোদিন বেড়াতে যেতো না। বাড়ীর কাজেই সারাদিন মেতে থাকে। পুত্রশোকে মর্মাহত আর বার্ধক্যের পথে অগ্রসরমানা শাশুড়ী কোনো কাজ করুন এটা যশোদা মোটেই সহ্য করতে পারতো না। বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যেই কাটিয়ে দিতো দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বছর।

যশোদা অন্য পথও ধরতে পারতো। সমাজবিরোধিতা করে বিশেষ সুবিধা

করে উঠতে পারতো না। কিন্তু সেপথ গ্রহণ করলে প্রভাকরের পড়াশুনা সেখানেই যেতো থেমে। প্রভাকরের ধরতে হত একটি সাধারণ কাজ। নস্যাৎ হয়ে যেতো প্রভাকরের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু যশোদা তা হতে দিল না। অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর বললো, "আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি চাকরি করবো। এতে আমার মোটেই দুঃখ হবে না মা। মেয়ের মত মনে করে আমাকে মা অনুমতি দিন। প্রভাকরের লেখাপড়া বন্ধ হতে দেবেন না।"

যশোদা অল্পবয়সেই মা-বাবাকে হারিয়েছে। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হারিয়েছে স্বামীকে। তারপর সে আজ একটি পরিবারকে ভালোভাবে দাঁড় করানোর জন্য চাকুরি করার অনুমতি চাইছে। সবদিক ভেবে শ্বশুর শাশুড়ী নীরব অনুমতি না দিয়ে পারলেন না।

সেদিন অফিস থেকে আসতে না আসতেই প্রভাকর ছুটতে ছুটতে এসে বলে, "বউদি, বউদি, প্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট! তুমি আজকের কাগজ দেখোনি? একেবারে ইয়া বড় ফটো তুলে দিয়েছে।" প্রভাকরের বি. এস-সির ফল বেরুবে তা যশোদা জানতো। তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, প্রভা পাস করবেই। তাই পত্রিকা দেখায় অতখানি কৌতূহল তার ছিল না। কিন্তু সে আশা করতে পারেনি যে তার ঠাকুরপো প্রভাকর একেবারে প্রথম স্থান অধিকার করবে।

"সত্যি বলছো? তাহলে মিষ্টি খাওযাও, সিনেমা দেখাও"—সিনেমার কথা মুখে বেরিয়ে পড়তেই থমকে থেমে যায়।

কিন্তু প্রভাও ছাড়বার পাত্র নয়। বউদিকে মিষ্টি খাওয়াবেই, সিনেমা দেখাবেই। নাছোড়বান্দা জিদ ধরেছে। শাশুড়ীও বলেন, "যাও মা, যাও, বেড়িয়ে এসো। খোকা যখন অত করে বলছে, যাও, একদিন না হয় ঠাকুরপোর আবদার রাখলেই।"

নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙবার ইচ্ছা কোনোকালেই ছিলো না। কিন্তু প্রভার আন্তরিক অনুরোধকেও না মেনে তার মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। প্রভার এই অনুরোধের উত্তরে 'না' বলাটা কঠিন হয়ে উঠলো। যশোদা রাজী হল।

তিনটি বছর পরে আবার সে আজ যাচ্ছে তার ঠাকুরপোর সঙ্গে সিনেমা

দেখতে। তিনটের শোতে কিশোর সাউয়ের 'সিন্দুর' বইটা দেখতে গেলো। হল থেকে বেরোতে প্রায় সাতটা বাজলো। সন্ধ্যার দিকে অফিস-ফেরতা ট্রামের ভীড়ে ওঠার চেষ্টা না করে হেঁটে যেতেই ভালো লাগলো তাদের।

'প্রার্থনা-সমাজ' পেরিয়ে মোড় ঘোরার সময় এক ফুল-বিক্রেতা এক ঝুড়ি চাঁপাফুল নিয়ে তাদের সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো। ফুলওয়ালা যশোদার মাথায় সিন্দুর নেই সেদিকে লক্ষ্যই করেনি।

"ফুল চাই মা?" লোকটি জিজ্ঞাসা করে। দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছে। ফুলওয়ালা নাছোড়বান্দা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

বউদি ফুল আজকাল পরে না, তা জেনেশুনেও প্রভা জিজ্ঞেস করে, "চাঁপাফুল নেবে না বউদি?" যশোদা গম্ভীরভাবে ঠাকুরপোর দিকে একবার চেয়ে আবার এগোতে লাগলো।

"নিয়ে নেবো বউদি? মা'ও চাঁপাফুল খুব ভালোবাসেন। পূজোর কাজেও লাগানো যাবে।" যশোদা কোনো কথা না বলে ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দু'টো মালা নিয়ে আরও দ্রুত গতিতে এগুতে লাগলো।

হাতে ফুল। তার সুগন্ধে ভরা মাধুরিমা যশোদার মনকে স্পর্শ করছে। মনে উঁকি মারে চাঁপাফুলে ভরা সেদিনের কথাগুলি। ফুলসজ্জার রাত্রি!" 'উনি' আজ নেই। চাঁপাফুলে আর কি হবে!

"বউদি, বড় ক্লান্তি লাগছে, চল, সামনের মোড়েই কফি-হাউস পড়বে; একটু চা খাওয়া যাক।"

"তোমার উপর পাগলামী ভর করেছে নাকি বলতো প্রভা, বাড়ী গিয়ে কি আর কফি খেতে পারবো না?"

"বাড়ীর কফিতো রোজ খাই বউদি, পাস করেছি বলেই আমরা আজ বেরিয়েছি, বাইরের কফি খাওয়ার জন্য।" কথা বলতে বলতে প্রভা কফি-হাউসে ঢুকে পড়লো।

অগত্যা পিছু ধরলো বউদিও।

রেডিওতে তখন অর্কেস্ট্রা বাজছে। আলো ঝলমল করছে। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে, নীচে ধবধবে চাদরে ঢাকা অনেক টেবিল, তার উপর ফুল সাজানো। এখানে-ওখানে সুবেশ নরনারীর ছোট ছোট জটলা। প্রকাণ্ড কফি-হাউসটা যেন

আশ্চর্য এক মায়া-জগৎ। পৃথিবীতে এত আলো, এত সমারোহ আছে! যশোদার অবাক লাগে।

"বউদি।"

"অ্যাঁ?"

"কফি এসেছে। খাও। না, তুমি দেখছি বউদি এই দু'বছরেব মধ্যেই একেবারে বুড়ি হয়ে যেতে বসেছো। এবয়সে কলেজের মেয়েরা, কত সহজ সরলভাবে আসে যায়। যতই হোক, জীবন শুধু রান্না করা আর চাকরি করার জন্যই নয় বউদি! জীবনে আনন্দ আছে, কথা আছে, গান আছে। এসব না থাকলে মানুস বাঁচতে পারে না। ..ফুলগুলো চুলে গুঁজে নিচ্ছো না কেন বলতো? এত কনজারভেটিব্ হলে কি চলে আজকালকার দিনে।"

এক কাতর যন্ত্রণায বিড়বিড় করে বউদি বলে, "আমার এই অভাগা জীবনে ফুল গুঁজে আর কি হবে ঠাকুরপো?"

"নিজের ভাগ্য নিজেদের গড়ে নিতে হবে বউদি! গড়ার জন্য প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যত দৃঢ়ভাবে মানুষ দাঁড়াতে পারবে, তত তাব জীবনে আসবে মঙ্গল এবং কল্যাণ।"

"আমাকে উপদেশ দিচ্ছো ঠাকুরপো?"

"না বউদি। আমার কথা হচ্ছে, যে-ফুল তুমি হাতে ধরে আছ, যে-ফুল তোমার ভালো লাগছে তা লোকভয়ে চুলে গুঁজবে না, এটা আমার ভালো লাগে না।"

যশোদার রাগ বেড়ে গেলেও ধমক দিয়ে তার মুখবন্ধ করতেও কেমন যেন বাধা পেলো মনে। কানে কে যেন তার মুখ রেখে চিৎকার করে বলছে—প্রভাকর ঠিক কথাই বলছে।

চারদিন পরে 'সিন্দুরের' একটি গান গাইতে গাইতে এসে প্রভাকর বলে, "এম. এস-সির সীট পেয়ে গেছি।" এক মুহূর্তের জন্য যশোদা থমকে গেলো। সবসময় প্রভা 'বউদি' বলে সম্বোধন করে থাকে, কিন্তু আজ সে ঐ শব্দ উচ্চারণ করেনি।

"বাবাকে জিজ্ঞেস করেছো?"

"হ্যাঁ, তিনি বললেন 'টাকা-পয়সার চিন্তা কি তোমার নেই?' আমি বললাম, 'না, টাকার চিন্তা কি, স্কলারশিপ তো পাচ্ছি। আর তা ছাড়া কেমিস্ট্রীর প্রফেসারের যখন এত ইচ্ছে আমাকে হায়ার এডুকেশনের জন্য বিদেশে পাঠানোর, আমি বা পিছ-পা হই কেন?' কি বল?"

"বেশ তো যাও। ভালোভাবে পাস করে এসো। টাকা যখন যা দরকার হয় জানাতে ভুলোনা যেন।"

প্রভা চলে গেল বিদেশে।

যতদিন যায় যশোদার মনে প্রভা সম্পর্কে চিন্তা বেড়ে যায়। প্রভার ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে? প্রভা কি বিদেশ থেকে ভালভাবে পাস করে আসতে পারবে? বিদেশে গেছে বলে তাকে কি কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে গররাজী হবে? সে কি বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করে আসবে? প্রভা কি আমার সম্পর্কে কিছু ভাবে? আমাকে সে কিভাবে গ্রহণ করবে? সেদিন 'বউদি' বলে 'আমাকে সম্বোধন করেনি কেন? 'সিন্দুর' বইয়ের মত সে কি সত্যি আমাকে......? এইসব সাতপাঁচ ভেবে চলে যশোদা দিনের পর দিন। আর করে চলে রুটিনে বাঁধা কাজ।

"তুমি মঞ্জুলা এখানে যে?"

"হ্যাঁ যশোদা, যেদিন থেকে তুমি এসেছো, সেদিন থেকে আমি এই ওয়ার্ডেই আছি। তোমার শাশুরী দুপুর পর্যন্ত বারান্দায় অপেক্ষা করেছিলেন। শেষকালে আমি বলে পাঠালাম ভয়ের কিছু নেই। জ্বর নেমে গেছে। সন্ধ্যায় আসতে হবে না বলেও দিয়েছি। বেচারি বুড়ো হয়ে গেছেন, কত কষ্ট হচ্ছে যাতায়াত করতে। কিন্তু গত সাতটি দিন কম জ্বালাওনি ভাই তুমি। আমি তো আছি এখানে। দেখছি তো সবকিছু। আরো দু'চারদিন আগে এলেই ভাল করতে। একেবারে মরতে মরতে বেঁচে গেছো। শেষে এম্বুলেন্স করে আনাতে হলো। তোমার ঠাকুরপো বিদেশে গেছে না?"

যশোদা মাথা নাড়িয়ে জানালো। তার মনে হলো প্রভার পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে, আমার অসুখের খবর পাঠানো হয়েছে, তবু...।

পাশের একজন মহিলা ঠিক সেই সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

"আপনি কাঁদছেন কেন?" যশোদা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করে।

"আমার 'উনি' আজও বোধ হয় আসবেন না। সাতদিন ধরে পথের দিকে চেয়ে আছি উনি আসবেন বলে তবুও…।"

"আজ হয়তো ঠিক আসবেন। আরও একঘণ্টা দেরী আছে।" যশোদা ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিলেও, সেদিন মহিলাটির 'উনি' আসেন নি।

পরদিন সন্ধ্যা ঠিক চারটের সময় যশোদার শাশুড়ী এলেন। শাশুড়ীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যশোদার ইচ্ছা করলো, প্রভাকর এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু মুখে কোন কথা সরলো না। শাশুড়ীর চোখে জল দেখা দিলো। যশোদা তা দেখে বলে, "ভয় কি মা, আমি তো সেরে উঠেছি। জ্বর তো কমেই গেছে।"

"দু'একদিনের মধ্যেই ভগবান করুন বাড়ী ফিরে এসো মা। প্রভা কাল সকালেই আসবে বলে খবর এসেছে।"

যশোদা কোনো কথা বলেনি। ঘণ্টা পড়ে গেলে শাশুড়ী চলে যান। পাশের মহিলাটি তখনও কাঁদছে। তার স্বামী সেদিনও আসে নি।

তারপর সারা গা কেঁপে জ্বর এলো। ৩৬ ঘণ্টা কিভাবে যে কেটেছে টের পায়নি। চেতনা ফিরে আসবার পর গায়ের উত্তাপ স্বাভাবিক হলো। শরীরের জোর যেন একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে। বারবার ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছিলো ঘড়ির দিকে। কখন বিকেল চারটে বাজবে। সবসময় মন বলছিলো এই বুঝি প্রভা এলো। কিন্তু যশোদা ঠিক করে উঠতে পারেনি, প্রভার জন্য তার মন কেন এত উতলা!

চারটে বাজলো। কিন্তু প্রভা এলো না; একঘণ্টা ধরে যশোদা ছটফট করছিলো। বারবার জানালা দিয়ে পথের দিকে অতিকষ্টে তাকালো। কাউকে না পেয়ে নিরাশ হলো। পাশের বউটি প্রত্যেক দিনের মত কাদতে শুরু করে দিলো। কিন্তু আজ তার কান্নার দিকে যশোদা মন দেয়নি। দেখা যাক আর এক ঘণ্টা। ৬টা বাজতে তখন মাত্র ১৫ মিনিট বাকী আছে। প্রভা ছুটে এলো। সেই যে প্রভা যে বলেছিলো জীবনে আনন্দ আছে, কথা আছে, গান আছে। এসব না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না!

এসেই পাশে বসে বউদির হাত ধরে জিজ্ঞেস করে প্রভা, "কেমন আছো ?"

প্রভা এই ধরনের সহজ হবে তা যশোদা ভাবতেই পারে নি। প্রভার হাতের স্পর্শ তার মনে এমন এক সাড়া জাগালো, যার অনুভূতি আগে কোনোদিন হয়নি। প্রভা যশোদার আংটি নাড়াচাড়া করার সময় তার মন ভরে গেলো এক অনির্বচনীয় আনন্দবিভূতিতে। আনন্দে চোখের জল যেন ছিটকে আসতে চায়।

"আসতে দেরী হয়ে গেছে। সকালেই প্লেন থেকে নেমেছি। এসে কেমেস্ট্রির ঐ প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে হলো।' সেখানে যাওয়ার ফলেই এত দেরী হয়ে গেলো। যাক্, তুমি কেমন আছ বউদি? জ্বর দেখছি এখন একটু কমই আছে।"

যশোদা হুঁ বলে চুপ করে থাকে। এখন নিজেকে শুধু এক আনন্দানুভূতির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ডুবিয়ে রাখতে চায়।

"খুব ভালোভাবেই পাস করবো। এরপরেই ভালো চাকরি পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।"

"বেশ ভালো," ক্ষীণস্বরে বলে যশোদা।

"আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। সার্টিফিকেটটা আসার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার পেয়ে যাবো। এসব এত সহজে কিছুতেই হতো না। ঐ যে বললাম না প্রফেসারের কথা—তাঁরই ছোট ভাই সবকিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। উনি না থাকলে আমি নিজের চেষ্টায় কি আর এতখানি পারতাম আজকালকার দিনে!......ওঃ, ভালো কথা, আর একটা সুখবর আছে। বলবো?"

হাসির রেখা টেনে যশোদা জিজ্ঞেস করে, "কী বলতো!"

"প্রফেসারের ঐ যে ছোট ভাইয়ের কথা বললাম, তার মেয়েকে বিয়েও করে ফেলবো ভাবছি। মেয়েটি মন্দ নয়। নাচে, গান করে, আনন্দে খেলে বেড়ায়। লেখাপড়ার দিকেও খারাপ কি—আই. এস-সি. তো পাস করেছে। ওদের মত, চাকরী পাওয়ার আগেই বিয়ে করে ফেলতে হবে। করেই ফেলি, কী বল?"

শেষের কথায় সম্মতি দেওয়ার মত শক্তি যশোদার আজ নেই। বুঁদ হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নীরবে পড়ে থাকে। ওয়ার্ডের ভীড় কমে

গেলো। ঘণ্টা পড়ার সময় হয়ে এসেছে। "কাল আসবো" বলে প্রভা চলে যায়। যশোদা পাশের খাটের মহিলাটির দিকে তাকায়। বউটির স্বামী ঝুড়িভর্তি ফল এনে দিয়ে গেছে। চাঁপাফুলের মালাও এনেছে একটি। প্রত্যেক দিন যে কাঁদছিলো, সে বউ আজ খিলখিল করে আনন্দে হাসছে। যশোদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা গুঁজে পড়ে রইলো।

মা

এস. কে. রামন

টেলিস্কোপের ছোট্ট একটু ছিদ্র দিয়ে নিষ্প্রভ বিমর্ষ তারাগুলির দিকে তাকালে যেমন কোটি কোটি মাইল দূরের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র কত কাছে, কত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি এ-পৃথিবীর ভাবী সমস্যা-সঙ্কুল পরিবার-জীবনের উদ্বেগ ও চিন্তাক্লিষ্ট ম্রিয়মান মাতৃরূপ ঘর-সংসারী খেলায় মত্ত একটি ছোট্ট বালিকার মুখে কত উচ্ছল, কত প্রাণবন্ত হয়েই না ফুটে ওঠে! এক টুকরো কাঁচের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সবটুকু রূপ উপলব্ধি করার অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে শিশুমনে লুকানো পবিত্র মাতৃত্ব দর্শনের অসীম আনন্দ থেকে কেই-বা বঞ্চিত হতে চায়! আর আমার মুগ্ধ মন তো তাতে তলিয়ে যাবেই।

সে বাচ্চা মেয়েটি খেলছে সামনের উঠোনে বসে। একটি পুতুল, পেতলের ছাট ছোট হাঁড়ি, থালা, বাটি, ভাঙা হাতা, আর মাটির খেলনার ভাঙা টুকরোগুলি ছড়িয়ে আছে কাছাকাছি।

উঠোনে ছোট্ট অংশটি ঘিরে রচনা করেছে সে একটি পরিবার। আর ঐ খেলনাগুলো তার সংসারের সরঞ্জাম। পুতুলটি তার মেয়ে। মেয়েটি নিজের মনের মত এক আলাদা সংসার পেতেছে সেখানে। রান্না হয়ে গেছে তার। কিন্তু পুতুলকে স্নান করানো হয়নি। ঘরে এক ফোঁটাও জল নেই। পাতকুয়ো থেকে আনতে হবে। দু'একটা হাঁড়ি-বাসনকে তুলে এদিক-ওদিক রাখতে রাখতে সংসারী বুড়িদের মত মেয়েটি জলের জন্য বিড়বিড় করছে। তার পরক্ষণেই আবার পুতুলকে কোলে নিয়ে চুপ করাচ্ছে।

আমি দাওয়ায় বসে তার খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছি

তার বয়স বছর পাঁচেকও হয়নি। তার শাড়ী পরার ঢং বড়দের মত, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল, দুষ্টুমিতে ভরা, মুখে যে কথাগুলো বেরুচ্ছে সেগুলো তার পূর্ণবুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই বহন করে।

"আজ এতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছো কেন মা?" পুতুলকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করে।

"চল্ তোকে চান করিয়ে আনি, দুষ্টু মেয়ে।" কথাটি শেষ করেই তাকে দুই হাতে ধরে উঁচুতে তুলে নাবিয়ে আবার চুমু খেয়ে স্নান করিয়ে আনে। ছোট্ট জামাটি পরায়। চুল আঁচড়ে দিয়ে পাশে রেখে চুমু খেয়ে বলে, "নে এবার খেল একটু, আমি সংসারের কাজকর্মগুলো সেরে নি।"

ইতিমধ্যে ওধার থেকে একটা বাছুর ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

আমি ছুটে গিয়ে তাকে তুলি। ভাগ্যিস্ কোথাও তেমন লাগেনি। কিন্তু তার মুখে ভয়ের রেখাগুলো ফুটে ওঠে। আমি তাকে আদর করে দাওয়ায় এনে পাশে বসাই। তার কাপড়ে লাগা ধুলো তোয়ালে দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে বলি, "কেঁদোনা লক্ষ্মীটি মা আমার, ভাল করে দেখো তো আর কোথাও লেগেছে কিনা? আর বাছুরকেই বা কি দোষ দেবো, সেওতো তোমার মত বাচ্চা। বাছুরটি তোমাকে দেখতে পায়নি, তাই তুমি পড়ে গেলে।"

"না মামা, তুমি জানো না, বাছুরটা খুব বদমায়েস।" মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অভিযোগ করে।

"হুঁ, সত্যি খুব বদমায়েস।"

আমি ভালোভাবেই জানি বাচ্চাদের চুপ করানোর সময় তাদের কথাতেই সায় দিতে হয়। এটাই ভালো পথ।

"হ্যাঁ মামা, ওটা সব সময়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। যার বাছুর সেও তাকে ছুটে ছুটে ধরতে পারে না।"

"ওটা কাদের বাছুর মা?"

"তুমি জানো না? ওটা তো তোমাদেরই বাছুর।"

আমি তার কথা ঠিক ধরতে পারি না। আমিও গাঁয়ে সেদিন ভোরেই এসেছি। হয়তো সে আমাকে চিনতে ভুল করেছে। আমাকে অন্য কেউ ভেবেছে।

ক্রমশঃ তার ফুঁপানি বন্ধ হয়। সে আমাকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মামা, এ বাছুরটার এতো ছোটার ঝোঁক কেন?"

বাচ্চারা মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করে যার উত্তর দিতে মাথাটা বেশ ঘেমে ওঠে। আমি ভাবছি কি জবাব দেবো। ইতিমধ্যে নন্দ চৌধুরী বাছুরটাকে টানতে টানতে সেইদিকে আসে।

"দেখলে, আমি যে বললাম, বাছুরটা সব সময় বদমাইসি করে। দেখছো, কি রকম টান মারছে?"

মেয়েটি নিজের কথা প্রমাণ করে। বাছুরটা সত্যি আমাদেরই বাড়ীর। আমি নন্দ চৌধুরীর আত্মীয়। চৌধুরীকে বলি, "তোমার এই বাছুরটি খুব শয়তান।"

"আর বোলো না ভাই, যখন-তখন মায়ের পেছনে পেছনে ছুটে যায় ক্ষেতের দিকে।"

"বাছুরটি এক্ষুণি এই মেয়েটিকে ফেলে দিয়েছে।"

"অ্যাঁ, ফেলে দিয়েছে? কিরে উমা, তোর লাগেনি তো?"

"হুঁ, লাগবে কেন? আমার গায়ে জোর নেই?"

নন্দ চৌধুরী আমাকে বলে, "একটু দাঁড়াও, আমি বাছুরটাকে বেঁধে আসি।" বলে সে চলে যায়।

মেয়েটি আমাকে আবার সেই প্রশ্ন করে।

"আচ্ছা মামা, এই বাছুরটা সব সময় ছোটে কেন?"

"ও ছুটে ওর মার কাছে দুধ খেতে যায়।"

"বেচারা! তাই।"

তার মুখে কারুণ্যের রেখা দেখা দেয়। কিছুক্ষণ পরে আবার সে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, তার মা তাকে ছেড়ে যায় কেন?"

এটি আরো কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল। আমার মনে হলো, তার এই প্রশ্নের পেছনে মা-মেয়ের সম্পর্কের কোনো ব্যাপার লুকিয়ে আছে।

"উমা, উমা!" ঠিক সেই সময়ে তার বাড়ী থেকে ডাক আসে।

"আমি যাচ্ছি মামা, মামীমা ডাকছেন।" বলে সে চলে যায়। আমাদের গল্প থামে।

আমি চোখ তুলে দেখি সামনের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা মহিলা। উমাকে তিনি বলেন, "নিজের খেলনাগুলো সব নিয়ে আয়, স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার খেলবি।"

সে-মহিলার কথার সুরে আছে মায়ের স্নেহ। কিন্তু উমা তাকে মামী বলে ডাকলো। হয়তো সে তার মা নয়, কথাটা এমন কিছু নয়। কিন্তু আমার কাছে এত তাৎপর্য্যপূর্ণ লাগলো যে আমি সহজে সে কথা ভুলিইনি, বরং ভূলে যাওয়ার নির্মম অন্যায়কে আপ্রাণ রুখে দাঁড়িয়েছি।

তারপর আমি আর নন্দ চৌধুরী বেরিয়ে পড়ি বেড়াতে। আমার খুব ইচ্ছা করলো নন্দ চৌধুরীর কাছে মেয়েটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানি। কিন্তু সে অবকাশ ঘটেনি।

রাত দশটার সময় আমরা বেড়ানো সেরে ফিসে আসি। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীগিন্নি যে খবর দিলো তা শুনে আমি শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেললাম। পাথরের মত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমার দেহটা। উমা মারা গেছে।

"কখন? কি করে? কি হলো?" একের পর এক প্রশ্ন করে যায় নন্দ চৌধুরী।

চৌধুরীগিন্নি বলে সন্ধ্যার সময় উমা নিজের মামীর সঙ্গে পুকুরে যাচ্ছিলো। ঠিক সেই সময়ে সিনেমার নায়িকা রমা কার সঙ্গে যেন ট্যাক্সি করে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। উমা তাকে দেখেই 'মা, মা' বলে ছুটে যায় তার দিকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পেছন থেকে এক মিলিটারি গাড়ী চলে যায় তার উপর দিয়ে। পরক্ষণেই সারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে উমার পিষে যাওয়া ছোট ছোট মাংসের টুকরো আর রক্ত। দু'চারটি টুকরো কুড়িয়ে তারা শ্মশানে গিয়ে এই মাত্র ফিরে এসেছে।

"তারপর? আর সেই নায়িকা কি করলো?"

"সেতো ফিল্মের নায়িকা। মনটাও তার ফিল্ম বনে গেছে। প্রাণ বলে কোনো জিনিসতো তার নেই। চোখ তুলে একবার তাকায়ওনি। ধুলো উড়িয়ে সোজা চলে গেছে ট্যাক্সি হেঁকে।"

আমার মন মথিত হয়ে উঠলো। এইতো মাত্র দেখেছি তাকে ছোট্ট একটি সংসার পেতে বিভোর হয়ে আছে; আর এখন সে সমস্ত সংসার ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তার পাতা সংসার যে এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। তার

রচিত পৃথিবী, এখনও আমার মনকে ব্যথিত করে তুলছে। এইমাত্র যা ছিলো পার্থিব সম্পদ, আর এখনি তা শোকার্তের স্বপ্ন।

নন্দ চৌধুরী সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের বাড়ী গেলো। আমিও সঙ্গে গেলাম। উমার মামার সঙ্গে দেখা হলো। সে হায় হায় করে কেঁদে উঠলো। কি সান্ত্বনা দেবো! উমার মামা বুক চাপড়ে হাউমাউ করে কেঁদে বলে, "আমার সব কিছু গেছে। টাকার লোভে গোলাপের মত অমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েকে আমি হারিয়েছি।"

কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দেওয়ার পর আমরা ফিরে আসি।

আমি নন্দ চৌধুরীকে প্রশ্ন করি, "উমার মামার অবস্থা দেখে আমি খুব ব্যথা পাচ্ছি। কিন্তু এসব ব্যথার আর কে খবর রাখে? এদিকে আর কার নজর আছে?"

"অনেক সময় নজর থাকলেও টাকার লোভে ভুলে যায়।"

"আমি তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না।"

"আমি বলছি টাকার জন্য মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।"

"আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারলাম না তুমি কি বলতে চাইছো। পরিষ্কার করে বল দিকি সব কিছু।"

নন্দ চৌধুরী উমার জীবন কাহিনী বলতে শুরু করে।

"উমা রূপবতী মেয়ে। বুদ্ধিমতীও বটে। কিন্তু তার ভাগ্য বিরূপ। মায়ের গর্ভে থাকতেই তার বাবার মৃত্যু ঘটে। জন্মের কয়েক মাস পরে তার মা'ও মারা যায়। তার এই মামা তাকে লালনপালন করে। বাচ্চা-বয়স থেকে এই মামা-মামীকেই উমা বাবা-মা বলে জানতো। সে কখনও জানতে পারতো না তার বাবা-মা বলে অন্য কিছু আছে কিনা। কিন্তু এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেলো।

"তার মামার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিলো। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে মাস্টারি করতো। বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোতো না। কোনোরকমে চলে যাচ্ছিলো সংসার।

"কিন্তু হঠাৎ স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। রোজগার কানাকড়িও নেই। চাকুরি খুঁজে হয়রান হয়ে যায়, পায় না।"

নন্দ চৌধুরী বলতে লাগলো, "তুমি হয়তো ফিল্ম ডাইরেক্টার সুন্দরের নাম শুনেছো। ওরকম ডাইরেক্টার হাজারে একজন হয়। নিজের ছবিকে ভালো রূপ দেওয়ার জন্য কোনো কিছু করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন না। নিজের প্রত্যেকটি ছবির নায়ক নিজেই হন। আর তার নায়িকা হয় রমা। রমা আর সুন্দরের মিলন ফিল্ম ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও ঘটেছে।

"তিনি একবার ছবি তুলতে এসেছিলেন। ছবিটির নাম 'মা'। বইয়ে আগাগোড়া মাতৃহৃদয়ের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

"সেই ছবির জন্য এক ফুটফুটে সুন্দরী বাচ্চা মেয়ের দরকার ছিল। আগাগোড়া সে মেয়েটিকে অভিনয় করতে হবে, কথা বলতে হবে, ছড়া কাটতে হবে, আরো কত কি! এত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য যতখানি চালাক এবং সুন্দর মেয়েব প্রয়োজন তা অনেক খুঁজেও তিনি পাননি। ঠিক সেইসময রমা হঠাৎ উমাকে দেখে। মুগ্ধ হয় তার রূপে আর কথায়। অবশেষে সুন্দর আর রমা উমার মামার কাছে আসে। উমার মামার তখন টাকাপয়সার দিক থেকে রিক্ত। প্রচুর টাকার লোভে রাজী হয়ে যায়, উমাকে ফিল্মে নামাতে। সঙ্গে সঙ্গে আর এক মারাত্মক শর্তেও রাজী হয়ে যায়। সুন্দর খবর নিয়ে জেনে নিয়েছিলো যে, উমা তার মেয়ে নয়। তিনি শর্ত করিয়ে নেন যে জীবন্ত অভিনয়ের জন্য রমা আর সুন্দরকে উমার কাছে তার বাবা আর মা বলে পরিচয় দেবে।

"উমার জীবন-নাট্য শুরু হলো। রমা আর সুন্দর তার মা-বাবা বনে গিয়ে তাকে নিয়ে কয়েক মাস বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলো। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অভিনয়ের দিক দিয়ে পটু। নিখুঁত মা আর বাবার ভূমিকা অভিনয করে গেলো, দীর্ঘ চার মাস লাগলো ছবি তৈরি করতে। রমার কাছে মাত্র চার মাস থাকলেও উমা রমাকে এক মুহূর্তও ছাড়তে পারতো না। মাঝে মাঝে তার মামা যেতো তার সঙ্গে দেখা করতে। তখন উমার ব্যবহার দেখে তারা বুঝতো যে কতখানি ভুল করেছে। ছবি বেরুলো, উমাকে ফিরিয়ে দিলো তারা। চারিদিক থেকে প্রশংসা আর টাকা কুড়োল সুন্দর আর রমা। উমা কিন্তু রমাকে ছাড়তে চাইলো না। কেঁদে ফুঁপিয়ে রমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, 'আমাকে পাঠিও না মা, আমাকে পাঠিও না মা, আমাকে পাঠিও না' বলে চিৎকার করে তার পায়ে মাথা কুটলো বারবার। নিষ্ফল হলো তার মাথা কুটা সুন্দর আর রমা এসে তাকে মামার বাড়ীতে ছেড়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চলে যায়।

"বছর কেটে গেলো কিন্তু উমা ভোলেনি তার মা-বাবাকে ; সে বুঝতে পারে না কেন তার বাপ-মা তাকে ছেড়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চলে গেছে। তার শিশুমনে এ প্রশ্ন বারবার উঁকি মারতে থাকে।

"অনেক চেষ্টা চললো তাকে ভোলানোর জন্য। ব্যর্থ হলো সব কিছুই। কচি মনে গভীরভাবে দাগ পড়েছে।"

সবশেষে নন্দ চৌধুরী বললো,"এখন জানতে পারলাম আজকে রমাই এসেছিলো এদিকে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে তাদের আউট-ডোর কয়েকটা ছবি তোলার জন্য। একবার ভেবেছিলাম তার মামাকে সাবধান করে দিই উমা যাতে না বেরোয় ঘর থেকে। কিন্তু কি আর করবো, বলার আগেই কার্য শেষ।"

মনে মনে অনেক কিছু চিন্তা করলাম। হয়তো মা আর মেয়ের সম্পর্কে একটি জীবন্ত ছবি পৃথিবীতে রেখে দেবার জন্যই উমার জন্ম হয়েছে। হয়তো সে আরও একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছে যে শিশুদের মন খুব কোমল, পবিত্র ; সে মনকে নিয়ে খেলা করা ভীষণ বিপদ।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নন্দ চৌধুরী নিশ্চুপ হয়ে রইলো। এক পাশ থেকে বাছুরটা ডেকে উঠলো—"আমবা !"

"বাছুরটাকে খুলে দি। বেচারা মা'র কাছে যেতে খুব ছটফট করছে।" নন্দ চৌধুরী বাঁধা বাছুরকে খুলে দিতে চলে যায়।



তেলেগু

দাদার যাওয়া সেপথে

আওয়াসারালা সূর্যরাও

বাবিলালদের মেয়ে কত যে লাবণ্যময়য়ী! রামধনু-রঙা শাড়ী আর আশমানী রঙের জামা পরে ঘরের কোণে বসে কোকিল-কণ্ঠে যখন গান গায় মনে হয় সুরের ঝরনা-ধারা যেন আপন নৃত্যচ্ছন্দে বিহ্বল। বেণীতে ছোট্ট একটি রিবন। কোমরটা কাঁটার মতন ক্ষীণ। যেন তারি কোমরের ছন্দোময় কৃশতা অজন্তার প্রত্যেকটি মূর্তিতে শিল্পীরা ধরে রেখেছে। দাদার সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। দেখতে যাওয়ার দিন বীণায় তুললো মহান গীতিকার ত্যাগরাজের একটি গানের সুর মূর্ছনা। তার গানের সময় মনে হয়েছিলো নীল আকাশের কোনো এক সুদূর নিরালা প্রান্ত থেকে কে যেন বাঁশি বাজায়। যেন কৃষ্ণের বাঁশি প্রতিটি মানব-মনের বিরহিনী রাইকে টানছে। আমাদের দিকে তাকালে দৃষ্টিতে মনে হলো ঝরে পড়ছে শিশির-স্নাত যুঁই ফুলের শুভ্রতা।

বাবা নাম জিজ্ঞাসা করায় ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'ইন্দিরা'। চলার সময় মনে হয় যেন ফুলের উপর হাঁটছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ সামঞ্জস্যময় গঠনে সুগঠিত। মেয়েটিকে দেখে ভাবি দাদার মত বদলে যাবে। আগের মত গোড়ামি করে 'বিয়ে করব না' আর বলবে না।

এবারে বাবিলালদের মেয়ের সঙ্গে। তুলনা করতে গেলে বলতে হয় এ যেন ভাবী মমতাজমহল আর দাদা আমাদের শাজাহান।

এর আগে মাণ্ডাপেটা থেকে যে প্রস্তাব এসেছিলো দাদা গররাজি হয়েছে। মেয়েটা নাকি পুতুলের মত সুন্দর। বিরাট বাড়ী আছে তাদের। প্রচুর জমিজমা। গাড়ীও নাকি আছে। আরও কত সব 'নাকি—নাকি—নাকির' ফিরিস্তি নিয়ে সম্বন্ধ করতে এসেছিলো। কিন্তু দাদা গররাজি। তারা মুখ চুন করে চলে যায়। তার

আগেও বহু সম্বন্ধ এসেছে। দাদা কোনোটাতেই রাজি হয়নি। বাবা বলেন, "তোর বিয়ে না করতে চাওয়ার কারণটা কী ?"

"আমার গলায় একটা বোঝা অহেতুক আমি রাখতে চাই না।"

"'তা তুই বিয়ে না করলে ভবিষ্যতে বংশে বাতি দেওয়ার তো কেউ থাকবে না !"

তারপরেই শুরু হতো বাবা আর দাদার মধ্যে বিয়ের যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতা নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক। সব কথা বুঝি না। মনেও থাকে না। তবে দাদার দু'একটি কথা মনে আছে। দাদা বলতো—আমরা তো দাস আছিই। আবার বিয়ে করে একটি মেয়েকে আমার আর সমাজের দাসী করে রাখতে চাই না। বর্তমান বিয়ের পদ্ধতি আমার ভালো লাগে না। স্ত্রী ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়ার যন্ত্র নয়। মানুষ যন্ত্র নয়। বিবাহ আজ বন্ধন। আর এ-বন্ধন বহুদিক থেকে শুধু বন্ধন নয়, বেঁধে মারা। হাজার বন্ধনের উপর আর একটি বড় বন্ধনকে ডেকে আমি আনবো না। আমাদের মত লোকের পক্ষে সেইদিনই বিয়ে-থা করা সম্ভব হবে যেদিন সমাজ নারীকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সত্যকার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে স্বাধীনভাবে এগিয়ে আসবার অধিকার দেবে।

আজ আমিও দাদার মত তর্ক করতে শিখে যাচ্ছি। দাদাকে তর্কের জন্য বাবা দেখতে পারেন না। যত রাজ্যের হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে নাকি দাদার মেলামেশা-দহরম মহরম। মনে হয় চালচুলো বলে কিছু নেই ওদের। ওদের নিয়ে নাকি দাদা স্বর্গ রাজ্য গড়বে। বাবা চাপা রাগে ফেটে পড়েন। মাঝে মাঝে বিষয়-সম্পত্তি থেকে দাদাকে বঞ্চিত করবেন বলে শাসান।

বেশ মনে আছে। কারা কারা যেন আসতো। কারো কুচকুচে কালো লিকলিকে চেহারা আর বাবরী চুল। একজনের আবার কোকিলের মত লাল চোখ। কারো বা এক চিলতে কাপড় আছে কোমরে। কারো বা চোখদুটো শ্বাপদের চোখের মত চকচক করে। রিকশাওয়ালারা আসে। কুলি-মজুর আসে। তার মধ্যে একজনের চেহারা কি ভয়ঙ্কর! কালো গাট্টাগোট্টা যমদূতের মত। ঠোঁট মোটা। কালো শরীরে সাপের মত আকাবাঁকা অসংখ্য শিরা যেন কিলবিল করছে। দাদা তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতো, আসতো সেই রাত-

দুপুরে। আমরা তখন সব ঘুমিয়ে। দাদার ভাত ঢাকা দেয়া থাকতো। দাদা আসতো অন্ধকারের বুক চিরে, বাতাসের ঝাপটায় পাক খাওয়া জোনাকির আলোয় পথ দেখে।

হঠাৎ যেন বাবাকে সেরাত্রে ভূতে পেয়ে বসলো। বুক চাপড়ে প্রায় মেয়েদের মতই কান্না শুরু করে দিলেন তিনি। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সাবইন্সপেক্টর নাকি বাবাকে বলে গেছে দাদাকে শাসনে রাখতে। তার সতর্কবাণী বাবার বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যেন। মাকে অভিযুক্ত করে তিনি বলেন, "তোমার জন্যই ছেলেটা আজকাল এত বেঁকে বসেছে। পুলিসের লোকেরা নাকি তার ফটো রেখেছে। আর তার প্রতিদিনের কাজকর্মের রিপোর্টও রাখে।"

দাদা কিসব যেন বলে। আজ দাদা যত চিন্তাশীল বাবা তত নন। বিয়ে না করে ছেলেটা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে বাবার বিশ্বাস। বাবিলালদের মেয়েকে দাদা নিশ্চয়ই পছন্দ করবে। গোলাপ ফুলের মত মেয়ে। মুখ যেন তার ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ।

বউদি আসবে। কোকিলকণ্ঠী চাঁদমুখী পুষ্পিতা বউদি আমাদের ঘরে আসবে। সে যে কি আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বউদি আসবে। বিয়ের সময় আমি মাঙ্গলিক গান গাইব। দাদার পা ধোয়ার থালাটা বক্‌শিশ হিসাবে আমিই পাব। শরবতের কলসীটা আমাকেই দেবে। কত ফুল আসবে ঘরে। শানাই বাজবে। সমস্ত বাড়ীটা কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে।

কিন্তু দাদা কি দুষ্টু! এখনও মনের কথাটি খুলে বলছে না। শেষে বললে তো বললে এমন কথা যার কোনো মানেই হয় না; সেই পুরনো কথারই জের—"বিয়ে এখন আমি চাই না, তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?"

বাবারও সেই পুরনো যুক্তি—"ব্যস্ত না হবেই বা কেন? বিয়ে না করলে সংসার টিকবে কী করে? ভবিষ্যতে বংশে বাতি দেবে কে?"

রাত্রে ঘরে বসে দাদা পড়াশুনা করছে। অদূরে কুকুরের আকস্মিক সমবেত চীৎকার। আবার সব চুপচাপ। কাছে কেবল ঝিঁ-ঝিঁর ডাক। নিরিবিলিতে দাদা পড়াশুনা করছে। পশ্চিম আকাশে গাঢ় এক পোঁচ মেঘ।

জানালা দিয়ে দাদাকে ডেকে বলি, "দাদা দেখে যাও। ঐ দেখ শুকতারা।" দাদা বইয়ে ডুবে থেকেই মুচকি হাসে। হাসি দেখে আমি বলি, "বইয়ে কি হাসতে বলছে ?"

দাদা নিরুত্তর, নিস্তব্ধ, কঠিন। উঃ দাদা বড় দুষ্টু। একটা কথা বললেই তো চুকে যায়। বললেই তো হয় পছন্দ হয়েছে।

ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে দাদা ?" উত্তর আসে, "বিয়ে তো করবো না।"

"আমি অনুরোধ করলেও না ? বাবা যে সব ঠিক করে বসে আছে। বাবিলালদের মেয়ে। নামকরা বংশের মেয়ে। কত লোক আসবে। রাঙা মামিমা ও রাহালা মাসীও আসবে। ঘরভর্তি লোক !"

আশ্চর্য ! দাদা এবার দরজাজানালা বন্ধ করে পড়াশুনা আরম্ভ করেছে। অথচ মাসখানেক পরে দাদার চোখে কাজল পরানো হবে। কপালে চন্দনের ফোঁটা পড়বে। গালে বিউটিস্পট।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। আমাদের বাড়ীর পিছনে তখন হৈ চৈ। বেটাছেলে যখনতখন মদ খেয়ে বউয়ের চুল ধরে টানতে টানতে মারে। অসভ্য, অমানুষ ! জেগে উঠে দাদাব ঘরে যাই। তখনও পড়ছে। যখনই দেখি পডছে ! পড়ছে ! পড়ছে ! যেন সরস্বতীর ও একাই পুজারী।

আমারও যদি বিয়ে হয়ে যায় …মাগো ! মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে ! পূজা-পার্বনের সময় মাত্র বাপের বাড়ী আসতে পারবো। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

আর একদিন দাদার কাছে গেছি পড়তে। দাদা বইয়ের কথার চেয়েও বাইরের কথাই বলে বেশী, আমি কিছু কিছু বুঝি ; বেশীর ভাগ বুঝি না। লোকে হাসবে দাদার কথা শুনলে। ওসব কি আর কখনো সত্যি হয়। আজকাল বড়লোক নাকি আরও বড়লোক হচ্ছে, গরীব নাকি আরো গরীব হচ্ছে। এমনদিন নাকি আসবে এসব যখন বদলে যাবে। ধনী-দরিদ্র থাকবে না ; সবাই নাকি সমান হবে। সব নাকি-নাকি-নাকি। কবে রাম রাজা হবে আর এসব 'নাকি গুলো ফলবে

বিয়ের এখনও একমাস বাকি। কিন্তু বাবার ব্যস্ততার সীমাপরিসীমা নেই। সারা বাড়ীর দেয়ালগুলোতে দু'দুবার করে চুনের পোঁচ পড়লো। পাতকুয়োর দেয়ালগুলো সারানো হলো। পাড়ার বড়লোকদের কাছ থেকে বিরাট বিরাট হাঁড়ি, কড়া, গামলা, ড্রাম এইসব এনে জড়ো করা হলো। বিয়ের বাজনাও ঠিক হয়ে গেছে। দুটো বাজনা। একটা ব্যাণ্ড পার্টি, অন্যটা শানাইয়ের দল। শহর থেকে শাড়ী, ধুতি আর জামা-কাপড়ের অন্ত নেই। আরো কত কি!

ভোরে মা দাদাকে কফি দিয়ে আসতে বললেন। গরম কফি নিয়ে দাদার ঘরে গিয়ে দেখি ঘরে দাদা নেই। সারা বাড়ী খুঁজি। ডাক দিই। দেখা পাই না। সাড়া পাই না। ড্রয়ার খুলে দেখি, একটি চিঠি। পড়ার পর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে। আশাবৃক্ষের মূল ধরে কে যেন নাড়া দেয়। ঝরে পড়ে সব ফুল। ঝরে পাতা। ঝরে সৌন্দর্য।

"………. সমাজের বাঁধনে আজ মানুষ নিষ্পেষিত। ভবিষ্যতেকে উজ্জ্বল করতে হলে আজকে থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুতিতে পিছুটান বাধা দেয়। নিষ্প্রয়োজনে আজ আমার বিয়ের ব্যবস্থা ……।"

এইসব কথাই দাদার চিঠিটাতে ছিলো। সমস্ত অক্ষরগুলো একত্রিত হয়ে যেন দাদার মুখ আঁকা হলো। সে মুখ যেন বলছে 'কেন চোখের জল ফেলছো?' দাদা নেই। ঘরে চেয়ারটা পড়ে আছে একাকীত্বের শূন্যতায়।

আমাকে আর কে পড়াবে। খুব ভালো লাগতো দাদা পড়ালে। দাদা থাকলে দশজন আসতো এ বাড়ীতে। কত কথা হতো। কত নতুন নতুন জিনিস জানতাম। ঘুমন্ত মানুষকে জাগানোর এত গল্প শুনতাম।

মা উঠোনে দুধ দুইছে। বাবা বাছুরটাকে ধরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে! নিমগাছে পাতা ঝরছে দু'একটা। চিচিঙ্গাগুলো ঝুলছে, এক ফাঁলি রোদ পড়েছে তাদের উপর। পাতকুয়ার কাছে বসে বাবা-মা কথা বলছেন। বিয়ের কথা নাতি-নাতনীর কথা।

পরীক্ষায় পাস করেছি। কতো বড় সুখবর। বাবা বলেন, "অন্তত একবার বাড়ীতে এসে তো দেখা করে যেতে পারতো। যাক্‌গে বয়স হয়েছে। ওর পথে ও থাক।"

আমি জানতাম চার দেয়ালের মধ্যে আটকে থাকার লোক দাদা নয়। দাদা পথে জনারণ্যের গান শুনতে চায়; দিন বদলাতে চায়।

সবসময় দাদারই চিন্তা মনকে তোলপাড় করে। ক্লাসে যাই। মাস্টার মশায় বোর্ডে যা লেখেন মনে হয় সে অক্ষরগুলো সব পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে দাদার মুখের ছায়ারূপ!

সন্ধ্যায় দাদার ঘরের কাছে যাই। জানালা খুলে ঘরের ভিতরে তাকাই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে ঢুকি। টেবিলের ওপর ভাবী বউদির যে ছবি রেখেছিলাম তা হাতে তুলে দেখি। হঠাৎ মনে হয় যেন দাদা পেছন দিক দিয়ে কাঁধে হাত রেখে বলছেন, "ওসব আর কেন বোন, আমি তো বিয়ে করবো না। তার চেয়ে বড় কর্তব্য পড়ে আছে।"

সেদিন বাবা ডেকে বলে, "কালকে পড়তে যেয়ো না; বাড়ীতে থেকো।"

"কেন বাবা?"

"তোমাকে দেখতে আসবে।"

কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলাম। যেপ্রশ্ন দাদার কাছেই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিলো তা যে আমার সামনেও আসবে তা কে জানতো। বুকে বাজ পড়লো। চোখ বুজে মাঝ রাত পর্যন্ত পড়ে থাকি বিছানায়। ঘুম আর আসে না। কালো রাত্রির বুক চিরে যেন দাদা আমাকে ডাক দিচ্ছে।

সারা গা ব্যথা। কেউ যেন তুলে আছাড় মেরেছে। কোমর আর পায়ের গাঁটগুলো টনটন করছে। আমাকে দেখতে আসবে। সমালোচনা হবে আমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, ভাবভঙ্গীর, আমার চলার, আমার বলার। তারপর পছন্দ-অপছন্দ।

দাদার সমস্ত বইগুলো যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমাকে কিছু বলতে চায়। ওদের মুক মুখে ভাষা ফুটেছে। আমি যেন শুনতে চাইনা। আলমারিতে যেন দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন আর আমি মুগ্ধ পতঙ্গের মত এগিয়ে যাচ্ছি সেদিকে। অন্ধকারের অক্টোপাশ যেন আমায় জড়িয়ে ধরেছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ি। কেউ নেই! ঘর ভর্তি অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার! হ্যাঁচকা টানে জানলা খুলি। বাইরে অপূর্ব জ্যোৎস্না। দাদা

অন্ধকার থেকেই ছিটকে বেরিয়ে গেছে ঐ আলোতে, নিজের জন্য নয় ভবিষ্যত মানবসমাজের জন্য। আজকের দিনকে সে ত্যাগ করেছে উজ্জ্বল আগামী দিনের জন্য। বারবার কানের কাছে বাজতে থাকে, 'নিষ্প্রয়োজনে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো না। তার চেয়েও বড় কর্তব্য আমার সামনে।'

সারা রাত ছটফট করি বিছানায় পড়ে। দাদার ঘর ছাড়ার ছবি স্মৃতি আমার দেহের শিরা-উপশিরায় স্নায়ুতে যেন উদ্বেল বিহ্বলতার নেশা ছড়িয়ে দেয়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় সমুদ্র মন্থন করে উঠে এক অপূর্ব অনুভূতি। গৃহ-ত্যাগে উদ্যত দাদার মনের যে ভাবতরঙ্গগুলি সেদিনের সেই রাত্রির ঘন অন্ধকারকে মথিত তরঙ্গায়িত করে তুলেছিলো তার প্রতিটি কল্পনাকে আজ আমি ধরতে পারি আমার মৃদু হৃদস্পন্দনের মধ্যে। আশ্চর্য। সে আর আমি যেন আজ অভিন্ন !

মৈথিলী

বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন

ঘোষবাবুর অতি সাধারণ ঘটনাকেও খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলা অভ্যাস। কাজেই তাঁর কথায় খুব বেশী ঝুঁকে না পড়ে আমি স্বাভাবিকভাবে বলি, "হয়তো বায়না ধরে পড়ে আছে, এক মুঠো ভিক্ষে দিয়ে দিলেই চলে যাবে।"

"না, না, একমুঠোর তো কথা নয়। আমি দশমুঠোও দিতে রাজি আছি। কিন্তু আই মিন…।" ঘোষবাবু চিন্তিত স্বরে বললেন।

"আপনি তো মশাই তিলকে তাল করে ভাবেন।"

"ও নো, নো, দ্যাট্ ইজ নট্ তিল্। বাট ইউ সি দ্যাট্ ইজ রিয়ালি তাল।" ঘোষবাবুর কথায় স্বভাবতই আমার হাসি পায়। কিন্তু ঘোষবাবুর সে হাসি খারাপ লাগে। তিনি বলেন, "একেবারে বুঁদ হয়ে পড়ে আছো। কলেরা পেশেন্টকে নাকি ফ্লূতে ধরেছে। একটু এসো তো আমার সঙ্গে! প্লিজ!"

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেশুনে বুকটা আমার সত্যিই ঢিবঢিব করতে লাগলো। ঘোষবাবুর দরজার সামনেই এক বুড়ি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জীবন-প্রদীপ প্রায় নির্বাপিত। জীবনের কোনো স্পন্দন নেই। কাদায় চোবানো লোকের মত চামড়াটা ঝুলে পড়েছে। পিলে-রোগীর মত পাঁজরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোখের কোণে জল আর এক গাদা পিঁচুটি। পরনে যা তাতে বুড়ি অর্ধদিগম্বরা। চোখেমুখে দারিদ্র্যের কাছে পরাজয়ের চিহ্ন।

বাড়ীর কম্পাউণ্ডের ভেতরে একটি ফুলের গাছে হাত বুলোতে বুলোতে ঘোষবাবুর বউ চাকরকে বকাবকি করছেন। বকুনির মূল কথা, রামধনি নেমকহারাম, দুর্বল। সারাদিন কাজকর্ম না করে পাশের বাড়ীর ডাক্তারের চাকরানীর সঙ্গে গল্প করে কাটায়। সে দরজার কাছে থাকলে কি আর এমন অলুক্ষণে কাণ্ড ঘটতো? কখনই না! সে থাকলে কি আর বুড়িটাকে তক্ষুণি তাড়া না করে ছাড়তো?

হঠাৎ আমাদের দেখে তাঁর গলার স্বর নামে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

ঘোষবাবু পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেন, "হোয়াট্ কুড্ বি ডান্? কি করা যায়?"

"কী করবেন? আপনি আমি আর এর কতটুকু কি করতে পারি?"

"কিন্তু এর অবস্থা তো মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ তো যে কোন মুহূর্তে···।"

"হুঁ।"

"ননসেন্স্। ইম্‌পসিবল্। আমার গেটের সামনে পড়ে কিছুতেই মরতে পারবে না।"

"মরতে পারবে না মানে? যেটুকু আলো মিটমিট করে জ্বলছে তা নিভে গেলেই হলো।"

মুখে বললেও ঘোষবাবুর মনে কিছুটা দয়া দেখা দিলো। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

"সবই ভগবানের লীলা!" কথাটি হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

"লীলা ছাড়া আর কি বলো? সারা শহরের মধ্যে আমার গেটের সামনে ছাড়া কি আর অন্য জায়গা ছিলো না? এখানেই যদি মরে যায় তো···।"

"তো' আর কি?"

"তা বলে লাশ এভাবে এখানে পড়ে থাকবে? আচ্ছা বিপদে পড়া গেলো তো। মিউনিসিপালিটি-হাসপাতাল—ধুৎ! আবার এটাও তো ভাবতে হবে, এই বুড়িটা এখানে অক্কা পেলে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কি অবস্থা হবে। এসব আগে পিছে ভেবেই আমি খুব ভোরেই তাদের পেছনের দরজা দিয়ে অন্য যায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা এক্ষুণি আবার একে দেখতে এলে তো গেছি আর কি। যে কোনো-রকমে একে একটু সরাতে পারলেই হবে। অন্ততঃ ঐ চৌমাথা পর্যন্ত। ঐ বাবলা গাছের তলায়···বাট্ হাউ?" ঘোষ বাবুর 'হাউটা' যেন আমার মনকে বিগড়ে দিলো।

মনে ক্ষোভ হলো। আমি বলি, "আপনি এই মড়ার উপর এত খাড়ার ঘা চালাচ্ছেন কেন? আপনার মনে কি একটুও দয়া নেই?"

"দয়া? দ্যাট্ ফিলজফি ইজ ওল্ড মাই বয়।"

ইতিমধ্যেই রামধনি দুটো বাসি রুটি আর তরকারি নিয়ে আসে। বুড়ির

কাছে যায়। তাকে তুটো চাটি লাগায়। বুড়ির দেহটা আগের মতই নিস্পন্দ থাকে। তারপর রামধনির আরো কি যেন খেয়াল হলো। হঠাৎ পাশের ড্রেনে হাত ডুবিয়ে এক আঁজলা জল নিয়ে বুড়িটার মুখে ছিটিয়ে দেয়।

বুড়ি আস্তে আস্তে চোখ খোলে। চোখের ময়লা আর পিঁচুটি চোখের তুটি পাতাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ওঃ, সে যে কী করুণ দৃশ্য! আজো মনে পড়লে গা ঘিন-ঘিন করে। বুড়ি যেন অনেক কষ্টে চোখ মেলে বলতে চায়, "তোমরা দয়া করে আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।" আমি আর এদৃশ্য দেখতে না পেরে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেই!

"রুটি নে, রুটি।" রামধনি চিৎকার করে ওঠে।

বুড়ির নিস্পন্দ শরীর যেন নড়তে চায়। কিন্তু সে নড়া শুধু কেন্দ্রীভূত চোখের তুটি পাতায়। আবর্জনাকে ঠেলে সে অবাক পৃথিবীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করছে। রামধনি তার মুখের কাছে এক টুকরা রুটি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। প্রাণপণ চেষ্টা করে বুড়ি সে টুকরাটি মুখের কাছে আনে।

এই ঘটনায় ঘোষবাবু চটে গিয়ে রামধনিকে বলেন, "ওরে গাধা, তোকে তো এই রুটির টুকরাটা দেখাতে দেখাতে ঐ দিকে নিয়ে যেতে বললাম।"

মালিকের ধমক খেয়ে আর তার ব্যাজার মুখ দেখে হঠাৎ রামধনি ফিক করে হেসে ফেলে। তার এহাসি ঘোষবাবুর কাছে আগুনে পেট্রোল ঢালার মত। তিনি রাগে ফুলে উঠে বলেন, "শালা, উল্লুক কোথাকার, আবার হাসি?"

এদিকে অনেক কষ্টে মুখে পুরে দেওয়া রুটির টুকরাটি বুড়ির গলায় আটকে যায়। তারপরই তার চোখ উলটে যায়। 'অ—অ' করে তুটো আওয়াজ কানে আসে। তারপরেই বমি।

ঘোষবাবু পেছনের দিকে ছিটকে গিয়ে নাকে রুমাল দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, "হায় ভগবান!"

"বুড়িটার মুখে তু'ফোঁটা জল দাও রামধনি," আমি বলি।

ইতিমধ্যে ঘোষবাবুর ড্রাইভার পায়খানার মগে করে জল আনে। বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে তু'ঢোক জল খায়।

রুটির টুকরা দেখিয়ে রামধনি বলে, "চল্ চল্ ঐ বাবলা গাছের তলায় চল্। এই সব রুটির টুকরো দেব। চল্ ওঠ।"

চোখেমুখে দারুণ ক্ষুধার চিহ্ন নিয়ে বুড়ি সেই রুটির দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তারপর মৃগী রোগীর মত কেঁপে রামধনির পেছনে পেছনে এক একটি পা ফেলে রুটির দিকে তাকিয়ে হাড্ডিসার কুকুরের মত এগোতে থাকে! সামনে রুটির টুকরো হাতে রামধনি, পেছনে হাড্ডিসার কুকুরের মত মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ি। বুড়ির চলে যাওয়া দেখে ঘোষবাবু আশ্বস্ত হলেন। স্বাভাবিক স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চা খাবি?"

আমার মনে তোলপাড় করছিলো অন্য কয়েকটি প্রশ্ন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসি, "কতদিন···আর কতদিন এভাবে ভুখা মানুষদের আমরা ঐ চৌমাথা পর্যন্ত এগিয়ে দেবো, ঘোষবাবু? আজ গেটের কাছে একজন বুড়ি মুখ থুবড়ে শুধু পড়েছিলো। আমাদের সহ্য হলো না। কিন্তু যেদিন এইসব ভুখা মানুষেরা মুখ থুবড়ে মরার আগে, জোট বেঁধে মিছিল করে আসবে সেদিন দেখবেন আপনার সহায়ক রামধনিও মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ দিয়েছে ঐ ভুখা মিছিলের সঙ্গে।"

রাস্তার পাশের ড্রেনের কোণ ঘেঁষে কাঁপতে কাঁপতে যাওয়া বুড়ির কঙ্কাল-গুলো যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকেছে পৃথিবীর বুকে। মুহূর্তকাল স্তব্ধতার পর ঘোষবাবু মুচকি হেসে আমার কাঁধে টোকা মেরে বললেন, "পাগল কোথাকার ওসব কথা ভাবতে আছে? যা বাড়ী যা।"

গুজরাতী

পাপের পথ থেকে

ঝাওয়ের চন্দ মেঘানী

কোলী এবং কোলন* হাটের বাইরে ফুটি বিক্রি করতে বসে।

হাট বসে মাত্র দু'দিন। এই দু'দিনের ভাড়া দিয়ে ঘর নেওয়ার মত অবস্থা তাদের নেই। তাই হাটের বাইরে রাস্তার ধারে চট বিছিয়ে ফুটি বিক্রি করতে বসে। কিন্তু দু'দিনের জায়গায় চারদিন ধরে তারা বসে রইলো তবু সমস্ত ফুটি বিক্রী হয়নি।

স্বামী-স্ত্রীতে বসে আছে। দেহের রং শ্যামবর্ণ। দোহারা নিটোল চেহারা। ছোট জাতের হলে কি হবে তাদের গায়ে তেল বা সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে যেকোনো ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থের পাশে বসিয়ে দিলে চেনা তো দূরের কথা আঁচই করতে পারবে না। এতই সুন্দর লাবণ্যে ভরা স্বাস্থ্য সেই কোলী আর কোলনের।

সংসারে যদি তপোবন হয় এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খাওয়া যদি যজ্ঞ করা হয় তবে তারাও নির্বিঘ্ন শান্ত তপোবনে দিনের পর দিন যজ্ঞ করে চলেছে। অনাহার অনিদ্রায় ফুটিগুলো বিক্রি করতে আজ চারদিন ধরে রোদ আর শীতে ঠায় বসে আছে। আজও তাদের মুখে আশার আভাস।

"আর মাত্র দু'বস্তা ফুটি রয়েছে। চট করে বিক্রী হয়ে গেলেই বাড়ী পালাবো।"

"হ্যাঁ, রুটি যা শুকনো কাঠ হয়েছিলো, তাও আজ সকালে খেয়ে সাবাড়

* গুজরাতের এক নিম্ন সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষদের 'কোলী ও কোলান' বলে।

করে দিয়েছি। মাত্র দু'দিনের তো খোরাক এনেছিলাম তার আর কদ্দিন চলবে।"

"থাকলেও খাবো কি করে, তরকারী নেই, সকালের মত ঘটি ঘটি জল টেনে ঐ রুটি গেলা যাবে না।"

"তুমি লক্ষ্মী ছেলেটির মত একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করলেই পারবে। তা হলেই আমরা আজ সন্ধ্যার মধ্যেই গাঁযে ফিরতে পারবো। একটু বেশী রাত হলেও ক্ষতি নেই। মা ঠিক গরম গরম রুটি বানিয়ে দেবে। আমিও না হয় রসুনের চাটনী বানিয়ে দেব'খন। তাই বলি, তুমি লক্ষ্মীটি এগুলো একটু চেষ্টা করে বিক্রি করে ফেলো না!"

স্বামীকে ছোটছেলের মত নানা কথা বলে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্তন্যপানরত কোলের শিশুকে আঁচল দিয়ে ঢেকে ফেলে। আঁচল টানতে গিয়ে হঠাৎ পিঠ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

"কিন্তু খদ্দের এলে তো!"

"আরে, আসছে না বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি আর হবে! তুমি একটু হাঁকডাক করলেই তো পারো। দেখবে তুমি একবার ডাকলেই বাঁশির আওয়াজ শুনে সাপ যেমন আসে ঠিক তেমনি খদ্দের সুড়সুড় করে এসে যাবে। দেখো দিকি আর সবাই কেমন চীৎকার করে খদ্দের জমাচ্ছে। তুমি তাদে চেয়েও কম কিসে যে পারবে না?"

"আমি বাপু আর ওরকম গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে পারবো না, আজ চারদিন চেঁচিয়েছি। আর আমাকে দিয়ে—"

"চেষ্টা করলে না পারার আর কি আছে বলো দিকি," মৃদুস্বরে স্বামীকে শোনাতে লাগলো, "এইযে বাবু, মিছরীর টুকরো নিয়ে যাও, মধুর মত বাবু, অমৃতের মেওয়া লুটে নাও বাবু।—নাও এবার বলো দিকি। এভাবে বলে একবার দেখো না কেমন মজা হয়!"

স্বামীটি আর কোনো কথা তো বললোই না, উল্টে গোঁ মেরে বসে রইলো।

"এমন করলে আগামী জন্মে ভগবান তোমাকে মেয়েছেলের জন্ম দেবে, হ্যাঁ।" এবার স্ত্রীলোকটি নিজেই হাঁকডাক করে খদ্দের ডাকতে শুরু করলো।

একজন বড় রকমের ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বাড়ীতে

আজ বিয়ে। বরযাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য ফুটি কিনতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি দর?"

"দু' পয়সা সের বাবু, একেবারে মধুর মত মিষ্টি—।"

"হুঁ, আনায় আড়াই সের তো পাশেই দিচ্ছে।"

"না বাবু ওতে আমাদের পোষাবে না, কতদূরের গাঁ থেকে এসেছি আজ চারদিন, আমাদের কষ্টের আর শেষ নেই। এই জিনিস ফলাতেও আমাদের কত কষ্ট করতে হয়েছে!"

"তা টাকা তো আর ফোকটে আসে না, খাটতেই হয়।" কথা শুনে কোলী বেশ কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

"নে বাপু, অতকথা না বলে একদর বলে সব মাল ওজন করিয়ে নি' তাহলে আমার বাড়ীতে আবার আজ বিয়ের ঝঞ্ঝাট আছে। এদিকে আবার বরযাত্রীদের আসার সময় হয়ে এলো।"

"ওরে বাবা, বরযাত্রী খাওয়াবেন, হাজার হাজার টাকা বিয়েতে খরচ করবেন, আমাদের দু'চার আনা দিতেও রাজী হচ্ছেন না বাবু!"

"থাম থাম, আর লম্বা-চওড়া বক্তিমে করতে হবে না। আনায় তিনসের দিবি তো দে। তোর কাটা-পচা যা মাল আছে সব নিয়ে নেবো।"

"না বাবু, ও দরে দিতে পারবো না। আমাদের তাতে মোটেই পোষাবে না।"

"পারবিনা তো পড়ে থাক্ আরও দু'দিন রাস্তার ধুলো খেয়ে।" বলে ব্যবসায়ীটি অন্যান্য বিক্রেতাদের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগলো। বারবার তার নজর এই কোলী আর কোলনের ফুটির বস্তার উপর পড়তে থাকে।

ব্যবসায়ীটির কথায় কোলী এবং কোলনের মধ্যে যেন নতুন এক চিন্তার স্রোত নেমে এলো। এই ধনীরা হাজারো টাকা, লাখো টাকা রোজগার করে, নষ্টও করে কিন্তু এই শাকসবজি কেনার ব্যাপারে পাই পয়সাও ছাড়তে চায় না। ওদের কথা শুনলে মনে হয় যেন আমরা এই পয়সা নিয়ে দোতলা—তিন তালা দালান হেঁকে ফেলবো। ব্যবসায়ীদের বিদ্যেটাই অলুক্ষণে। বাপ ছেলেকে শেখায় পরের কাছে নিতে আর পরকে দেওয়ার সময় ঠকিয়ে দিতে। এ যেছেলে করবে সে-ই নাকি বড় ব্যবসায়ী হতে পারবো।

স্বামী-স্ত্রীতে এই কথাবার্তা যখন চলছে তখন এক ভদ্রমহিলা ছোট্ট রঙীন রুমাল দিয়ে নাকের অগ্রভাগ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে দু' একটা সোনার গয়না আছে। পরনে রেশমের শাড়ী। পায়ে ক্রেপের সুন্দর চটি। হাতে ছোট্ট একটি ভ্যানিটি ব্যাগ।

"ফুটির কি দর ?"

"দু' পয়সা সের দিদি।"

"বাপরে, ফুটির আবার এতদর হয় নাকি ? নাঃ তোমরা কোলীরা দেখছি একেবারে লুঠতে বসেছো। নাও, তাড়াতাড়ি ওজন কর, আমাকে আবার মন্দিরে যেতে হবে —একি একসের জিনিস চাচ্ছি, ওভাবে ওজন করছিস কেন ? ভালো করে ওজন কব। আমাকে বাচ্চাছেলে পাসনি যে ঠকাবি।"

"নাও দিদি, এই বেশী করে দিচ্ছি"—বলে আধসের বেশী দিয়ে দিলো।

"নে, এবার বেশ পাকা দেখে একটুকরো ফুটি দে দিকি, ছেলেটা আবার বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাইবে। একটুও তর সইবে না।"

"আবার একটা টুকরো দিতে হবে দিদি ?"

"আমি কি ফোকটে চাইছি, জিনিস কিনেছি তাই—"

"কিন্তু দিদি—"কোলীর প্রতিটি মুহূর্তে মনে পড়তে লাগলো তিন মাস প্রাণপণ কষ্ট করে তারা এই ফুটি ফলিয়েছে।

"না দিসতো নিয়ে নে তোর ফুটি।"

"দিচ্ছি দিদি।" টুকরোটা দেওয়ার সময় তার মনে হলো যেন সে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিচ্ছে।

"আচ্ছা এই বড়লোকদের মন অত ছোট কেন বলো দিকি ? আমার তো মাঝে মাঝে এইসা রাগ ধরে যে কি বলবো !"

"রাগটাগ করোনা লক্ষ্মীটি, একে অন্য গাঁ, তার ওপর কিছু হলে ছোটজাত বলে পুলিস সব ফেলে আমাদের দোষটাই দেখবে।"

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এমন সময় একজন পুলিস লাঠিভেঁজে 'মেরে পিয়া গায়ে রেঙ্গুন, ওঁহাসে কারে হৈ টেলিফোন' ..গান গাইতে গাইতে এসে একটা ফুটি নিয়ে চলে যায়।

স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের দিকে আবার দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো। স্ত্রীটি কিছুক্ষণ পরে হেসে বলে, "এও একটা আচ্ছা ঝামেলা।

"তোমাকে চেনে ?" স্বামীর চোখে সন্দিহান দৃষ্টি।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?" স্ত্রী হেসে বলে।

"চার পয়সার মাল এমনি তুলে নিয়ে গেলো, আর তুমি হাসছো ? শালার ঢং দেখো যেন আমাদের কত পিরিতের লোক !"

"যাক্‌গে, ও আর কি করা যাবে," স্ত্রীটি তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "ঈস, দেখা তো তোমার ধুতি-গামছা কি বিশ্রী নোংরা হয়েছে ! বাড়ী গিয়েই এটাকে একেবারে দুধের মত ধপধপে পরিষ্কার করে দেবো। লক্ষ্মীটি, একবার হাঁকো দেখি।"

স্বামী তার মিষ্টি কথায় একদম শান্ত হয়ে সলজ্জভাবে হেসে বললো, "তোমার দিব্যি বলছি, আমার বড় লজ্জা করে চিৎকার করে খদ্দের ডাকতে।" তখন স্ত্রী নিজেই আবার আরম্ভ করলো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তমান সূর্যের লাল আভা তাদের ক্ষুধাতুর, শ্রমক্লান্ত এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্য চাঞ্চল্যে-ভরা মুখের ওপর পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো।

"বাড়ী ফেরার সময় পয়সাকড়ি তোমার পাগড়ীর ভাঁজে বেশ করে লুকিয়ে রেখো। রাস্তায় আবার কঠিদের (গুজরাতের একটি অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাতদলের আবাসস্থল) গ্রাম পড়বে।" আশঙ্কাভরা মুখে স্ত্রী উপদেশ দিলো।

"ধরলে কি আর পাগড়ীটা বাদ দেবে নিতে !"

"বেশ, তা হলে আমিই না হয় টাকাকড়ি নিজের কোমরে রাখবো।" কাছের ছাগলটাকে তাড়িয়ে আবার খদ্দের ডাকতে থাকে।

"কত করে ফুটি ?" বলে একজন যুবক তাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাদের সামনে বসে পড়ে বলে, "নাও তাড়াতাড়ি ওজন কর।"

"সুমন লাল", পাঞ্জাবী-পরা ঐ ব্যবসায়ীটি দূরে বিড়ি টানতে টানতে ইশারায় যুবকটিকে ডেকে নিলো।

ব্যবসায়ীটি পরামর্শ দেয় যুবকটিকে, "অত তাড়াহুড়ো করছো কেন ? আরে ওরা দূরের গ্রাম থেকে এসেছে। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে দেখছি। ওরা এখন

পালাতে পারলে বাঁচে। একটু সবুর কর, দু'জনে মিলে আমরা তিন সের করে কিনে ভাগাভাগি করে নেবো'খন।”

স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো।

“আমাদের খদ্দের ভাগানোর তাল করছে দেখছো, ঐ পাঞ্জাবী-পরা বাবুটা ?”

“আমার এইসা রাগ ধরছে যে কি বলবো তোমাকে।”

কোলনের পায়ের রক্ত মাথায় উঠেছে। মনে মনে সে যেন একদল ব্যবসায়ীকে লাঠিপেটা করতে উদ্যত।

সুমন লাল অর্থাৎ সেই যুবকটি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেই ব্যবসায়ীটির কাছে। মনে হল সে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বারবার ঘড়ি দেখছে। ব্যবসায়ীটি এক নজর ঐ ফুটি-বিক্রেতাদের দেখে যুবকটিকে আটকে রাখবার জন্য নানাকথা আরম্ভ করে দেয়।

“কলেজে ক'টায় যাও ? পরীক্ষায় কি রকম নম্বর ওঠে ? স্ট্যাণ্ড করতে পারো ? এল্.এল্ বি. শেষ করতে আর কত বছর বাকী ? পাস করে বিলেতে যাবে, না গান্ধীবাবার দলে যোগ দেবে ?”

“সে পরে যা হবার তাই হবে।” যুবকটি অধৈর্য হয়ে ফুটি-বিক্রেতাদের দিকে পা বাড়ালো।

ব্যবসায়ীটি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললো, “ছি-ছি, সব মাটি করবে দেখছি। আরে এতক্ষণ দাঁড়ালে আর মাত্র কয়েক মিনিট কাটাতে পারবে না ?”

“আমার আর মোটেই সময় নেই।”

“ছ্যা-ছ্যা, কলেজে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ছ্যা! এই নিয়ে জীবনে কতটুকু এগোতে পারবে ?”

যুবকটি কোনো উত্তর না দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কাছে এসে অর্ডার করলে, “নাও, তাড়াতাড়ি আধমণটাক্ ওজর করো দিকি, আমি মুটে ডেকে আনছি।”

কোলন তখন প্রতি পাঁচ সেরে একসের করে বেশী দিতে লাগলো। দেখে ব্যবসায়ীটি কাছে এসে বললো, “আরে ব[illegible]টা, এতো একই হিসাব হলো।”

“কেন ?” কোলনের চোখে [illegible]ষ্টি।

“আরে, প্রত্যেক পাল্লাতেই যে এত[illegible] দিচ্ছিস, তা আমি আনায় তিন-সের চেয়ে এমন কি অন্যায় করেছিলাম ?”

"আমরা বাবু লোক ঠকিয়ে খেতে পারি না। আজ চারদিন ধরে শুকনো রুটি চিবোচ্ছি, লোক ঠকানোর জন্য নয়। এখন আমাদের পেটে মোচড় দিচ্ছে।" উত্তর দিল স্ত্রীটি। স্বামী ওজন করে চলেছে। শেষে চার পাঁচটা ফুটি রয়ে গেলো। যুবকটি সেগুলোও ওজন করতে বললো

"না।" স্ত্রী বলে, তারপর স্বামীকে বলে, "এই ক'টা, আর ওজন কি করবে, এমনি ফাউ দিয়ে দাও।" যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমরা পেটভরে খাও বাবু, আরামসে খাও।"

যুবকটি এদের ব্যবহারে মুগ্ধ হলো। জগতের কোন কাব্যে যেন সে এমন জীবন্ত অনুভূতির আভাস পেয়েছিলো। সকৌতুকে প্রশ্ন করে, "কোত্থেকে আসছো? কোথায় ফুটি ফলিয়েছো? ক'মাস ধরে এর পেছনে খেটেছো। তোমার অসুবিধা কি? অভাব কি? এর থেকে কত রোজগার হয়? এখানে কি তোমাদের চেনাশুনা ঘর নেই? শুকনো রুটি খাচ্ছো কেন?"

প্রত্যেকটি জওয়াবে বিস্মিত হলো সে। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মিষ্টি আলাপ, কোনো বিষয়ের মতামত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠলো।

নানা কথাবার্তা চালাতে চালাতে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে চট-ঘটি-বাটি গুটোতে লাগলো। স্ত্রীটি গুছোতে গুছোতে স্বামীকে এটা-ওটা নির্দেশ দেয়। স্বামী নীরবে তা পালন করে চলে।

সব দেখেশুনে যুবকটি বললো, "তোমার কথাতো তোমার স্বামী খুব মানছে!"

"কেন মানবে না। আমার মায়ের হাতের গরম গরম রুটি খাবো যে! কি গো ঠিক বলছি না?"

স্বামীর ঠোঁটে সমর্থনের স্পন্দন।

"এর পরের বার তো আমরা আরেকটা মেলায় যাবো।"

ততক্ষণে ঐ ব্যবসায়ীটি সপ্তম বিড়িটা টানতে টানতে হাজির হলো।

"কি হে সুমন লাল, তোমার মাল কোথায়?"

"সে তো অনেকক্ষণ মুটের মাথায় চড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বা-বা—দেখোগে যাও, ওদিকে মুটেটা হয়তো বেশ কয়েকটা ফুটি লোপাট করে বসে আছে। তা তুমি তো দেখছি অনেকক্ষণ গল্পে মেতে আছো। ঘড়ির

কাঁটাটা থেমে গেলো নাকি ?" বেশ খানিকটা কটাক্ষ করে ব্যবসায়ীটি কথাগুলো ছুঁড়লো।

"আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম এদের। কত সহজ সরল আর সুন্দর জীবন এদের! কী সুন্দরভাবে এরা এক মন, এক প্রাণ হয়ে বাস করছে। কত সহজ প্রেম !"

"ও! তাহলে আজকাল কলেজে এই সব শেখানো হয় বুঝি ? তা বেশ তো কলেজের ভেতরে এদের বসালেই হবে। কত সহজ প্রেম এদের।"—তার কথার মধ্যে নিম্নস্তরের ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট।

"তা দেখা যাক। কারণ এদের তো আর শেয়ার বাজারে বসানো যাবেনা। বসলে টিকতেও পারবে না। হাঙ্গর-কুমীরের তো আর অভাব নেই !" দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল সুমন লাল।

"দুঃখিত, সেখানে মেয়েছেলের প্রবেশাধিকার নেই।"

"সেটাও আমাদের পেছনে-পড়া অবস্থার একটা বড় কারণ। মেয়েদের আমরা রান্নাঘরের চার দেয়ালের মধ্যে রাখতে পারলেই বাঁচি।"

এদের কথাবার্তা চলতে চলতে কোলী আর কোলন দম্পতির সবকিছু গুছানো হয়ে গেছে। স্ত্রীটি মাথা ঝুঁটি করে সবকিছু নিয়ে নিয়েছে। স্বামী ছেলেটাকে কাঁধে চাপিয়েছে। ছেলেটি বাপের মাথায় মাথা নুইয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

"আচ্ছা বাবা, রাম রাম। আপনার দয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পৌঁছে গরম রুটি খেতে পারবো।" স্ত্রী বিনয়ের সঙ্গে বললো।

"আমার দয়ায় নয়। বরং তোমাদের মেহনতের দয়ায় আমরা খেতে পারছি, বোন।"

যুবকটির মুখে 'বোন' সম্বোধনটি শুনে স্ত্রীর সামনে যেন নতুন দুনিয়ার দরজা খুলে গেলো।

"আমি যখন রাজপুর যাবো তখন তোমাদের বাড়ীতে যাব।" যুবকটি বললো।

"নিশ্চয় নিশ্চয় আসবেন আমাদের বাড়ীতে। আপনাকে গঙ্গামায়ের দিব্যি করে বলছি, নিশ্চয় আসবেন কিন্তু।"

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা যখন তার গেরুয়া রং-এর কাপড় পরে বিদায় নিলো

তখন অষ্টমীর চাঁদ রাত্রির আকাশে সাদা মেঘের ওড়নায় ঢেকে খেলা আরম্ভ করেছে।

এই সময় তিন জায়গায় তিনরকম কথা শুরু হলো।

সেই ব্যবসায়ীটি নিজের বাড়ীতে আগত বরযাত্রীদের কাছে সুমন লালের কথা বলে কলেজ-ছাত্রের ব্যবহারিক-জ্ঞানের উপর কটাক্ষ করে বললো, "আরে, বেনের বুদ্ধির অভাবে কথায় বলে রাবণের রাজ্যই চলে গেলো।" একটু পরে নিজেই মন্তব্য করলো, "যা বলছি একদম লাখ টাকার কথা বলছি!"

সেই যুবকটি নিজের বোনের কবল থেকে তার বউকে ছাদে ডেকে এনে কোলী এবং কোলন দম্পতির যাওয়ার পথটা দেখিয়ে বললো, "দেখো সবিতা, ঐ দেখো কেমন সুন্দর দু'জনে সহযাত্রীর মতো এগিয়ে যাচ্ছে। এরা প্রত্যেকটা পদক্ষেপে বাধা পেয়েও সব কিছু সরিয়ে পথ চলছে। আমাদের সহ-জীবন কেবল সিনেমা-থিয়েটার আর রাত্রের কয়েক ঘন্টায়। আমি উকীল, তবু তুমি সারাটা জীবন শুধু রান্নাঘরেই পড়ে থাকবে। একটুও অফিসিয়াল কাজে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ নিজেরা শিক্ষিত আর সম্পদশালী বলে গর্ববোধ করি জাতির অগ্রদূত বলে। কিন্তু আমার মতে সত্যিকারের অগ্রদূত যারা তারা ঐ দেখো অমরাপুরের পথে এগিয়ে চলেছে সহযাত্রীর মত।"

কোলী আর কোলন চলেছে। ছেলেকে কাঁধে শুইয়ে স্ত্রীর হাতে হাত দিয়ে স্বামী বলে, "মাইরি বলছি, আজ আমার এইসা মাথা গরম হয়ে গেছলো তা কি বলবো। এই পাঁচ বছরের মধ্যে এমন কোনোদিন হয়নি। একদিকে ঐ শালা পুলিসটা আর ঐ রঙীন বটুয়া (ভ্যানিটি ব্যাগ) ঝুলানো মেয়েটার ব্যবহার, আর অন্যদিকে ঐ শুয়োর ব্যবসায়ীটা। রাগে আমার মাথার খুলি ফেটে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিলো।"

"এই দেখো, সব বুঝেশুনে ন্যাকামো। আরে, মাথা গরম করলে কি আর চলে? মাথা ঠাণ্ডা রেখে কেনাবেচা করতে হয়।"

"না—না। আমার কথা হলো, এত খাটাখাটুনির পরও যদি রুটি না জোটে তো ডাকাতের দলে ভিড়ে যেতে দোষ কি।"

"হয়েছে। ডাকাতি করবে।" কথাটি বলে স্বামীকে একটি চিমটি কাটে।

"বাদ দে, চুরিডাকাতি করলে খুব জোর দু'একমাস জেল হয়। তাও টাকা ঢালতে পারলে বেকসুর খালাস। আর জেলে থাকলেও একবেলা নয় একেবারে দু'দু' বেলা রুটি পাওয়া যায়। সঙ্গে ডাল-তরকারীও দেয় নাকি।"

"কিন্তু ওগো, যতই বলো তুমি ওখানে দুটো জিনিস পাবে না। তোমার চোখের জলও শুকোবে না।"

"পাবোনা আবার কি ?"

"এক হচ্ছে তোমার কাঁধের ঐ শিশুর হাসি আর দুই আমাকে।"

"হাই লাও, আরে ঐজন্যই তো এই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফুটি ফলিয়ে পেটে শুকনো রুটি ঢালছি। না হলে এই দুনিয়ার ঐ ব্যবসাদার আর পুলিসদের ব্যবহারে তো লোকে সবসময় চুরি আর ডাকাতি করার দিকে ঝুঁকে পড়তো। কিন্তু তবুও—। এর কোনো বিহিত না হলে তো আমরা মারাই পড়বো।"

"নিজেকে এমন ছোট করছো কেন ?" চাঁদের আলোয় স্বামীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখতে পেলো। স্বামীর কণ্ঠস্বরও আবেগ আর বেদনায় রুদ্ধ হয়ে এলো। এসব দেখে অনুকম্পায় স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললো, "তুমি পুরুষ, ছি-ছি, একি। কাপুরুষের মত নিজেকে এত ছোট ভাবছো কেন ?"

"হ্যাঁগা, আমরা দু'জনে দিন-রাত কতো খেটেখুটে চলেছি তবু দুবেলা রুটি জোটে না। ওরা বাংলো দালান বাড়ী হেঁকে বাস করে। দামী জামাকাপড় পরছে, সোনা-হীরার গয়না-গাটি পরছে, তোমার-আমার মত লোকের খাওয়ার মত খাবার ওরা নর্দমায় ফেলে দেয়। ক্লাবের বাজনা আর সিনেমা না দেখলে এদের সেদিনই কাটে না। আর আমরা! পুরো ঘুমও হয় না আমাদের! কি গো, কিছু বলছো না কেন ?"

"তোমাকে দেখছি চিন্তার ভূতে পেয়েছে!"

"সত্যি বলছি আজ আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। তুমি জানো ডাকাতেরা মাসে কত আমদানী করে ?"

"ফের যদি এইসব কথা বলবে তোমাকে আমার মাথার দিব্যি দিচ্ছি, হ্যাঁ! —এইতো আমরা অমরাপুরের সীমানায় এসে গেছি! আমাদের গাঁয়ে পৌঁছে গেছি।" কথাটি শেষ করে স্বামীর গালে তার শীতল হাত রাখলো।

সমাজের পিলসুজ এই মানুষ, অষ্টমীর চাঁদের আলোকে আলোকিত আকাশের নীচে বসে সমাজের উপরতলার লোকদের অন্যায় আর রূঢ় আঘাতের চাবুকে জর্জরিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সমাজের দুষ্টব্রণ হয়ে, ডাকাত হয়ে জীবন যাপনের সংকল্প নিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার স্ত্রীর ভালোবাসা, ছেলের প্রতি তার টান তাকে সংকল্পচ্যুত করলো। তাকে পাপের পথ থেকে ছিনিয়ে আনলো।

সিদ্ধী

রাজা

উত্তম

কত কাগজ-কালি খরচ করে, কত অফিসের জাঁকজমকে চোখ ঝলসিয়ে, কত জোড়া জুতোর তলা ক্ষইয়ে, কত জামাকাপড় ঘামে পচিয়ে, কত শত অলিগলি পেরিয়ে রূপকথার রাজপুত্তুরের মত অবশেষে লাভ করলাম বেকার জীবনের সাত রাজার ধন এক কেরানীর চাকুরী। কিন্তু তখনি রাজকন্যা 'স্থিতি'-সুন্দরীকে না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন হইনি।

অফিস পুরীতে আমার শুভ পদার্পণে শুধু একজন লোকই খুশী হয়ে আমাকে অভ্যর্থিত করেছিলো। সে হলো আমার মহারাষ্ট্রীয় চাপরাশী 'রাজা'।

বেশ কিছুদিন পরে সে এক ছুটির দরখাস্ত নিয়ে এলো। অনেক কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসলো, "সিদ্ধিবাবু, আপনি বিবাহিত তো?"

স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করলাম আশ্চর্যসূচক জবাব, "হ্যাঁ"।

"ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই আছে?"

"হ্যাঁ, একটি মাত্র ছেলে। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলে যে? কী ব্যাপার?"

তার ভাষা বলে দিলো কিছু না, কিন্তু তার ভাব বুঝিয়ে দিলো অনেক কিছু। তাই আমি করে চললাম সুকৌশলী প্রশ্ন, আর তার জবাবে বেরিয়ে এলো—"আপনার আগে যে কেরানীবাবু ছিলেন তিনি বয়সে ত্রিশের কাছাকাছি হলেও বিয়ে-শাদী করেননি তখনও। কিছুদিন আগে আমার বউয়ের শরীর খারাপ বলে ছুটির আবেদন পেশ করলে তিনি কী ভোগানটাই ভুগিয়েছিলেন—তা চিন্তা করলে পৃথিবীটাকে প্রাণহীন বলে মনে হয়। আপনিই বলুন দেখি, তিনি বিবাহিত হয়ে বউ-ছেলেমেয়ে বাড়ীতে রাখলে আমাকে কি এভাবে ভোগাতেন?"

আমি বলে উঠলাম, "তাই বলো। এই ব্যাপার? তুমি আমার কাছেও সেই

ভয় করছিলে নাকি? ও, চুন খেয়ে মুখ পুড়েছে এখন দই দেখলে ভয় করে আর কি।"

একটু ইতস্ততঃ করে সে বললো, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"না না, চিন্তার কোনো কারণ নেই।" সম্পূর্ণ নির্ভয় ও ভরসা দিয়ে বললাম, "তুমি বিশ্বাস করো ওরকম হবে না।"

রাজার সহজ সরল কথাগুলি আমার ভালো লেগে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ক'টি ছেলেপুলে?"

"ছুটো"

"কত বয়স হবে বলতো তোমার?"

"একুশ"

"বিয়ের সময় তা হলে তুমি খুব ছোট ছিলে, না?"

"আজ্ঞে ঠিক বলেছেন বাবু। আমরাতো বাবুদের মত যৌবনটাকে মাঠে মারা দিয়ে বিয়ে করি না?" এই বলেই সে তার কাজে চলে গেলো। আর তার খোলা মনের সেই কাটা কথাগুলো আমার মনের পাতায় কেটে দিলো কতকগুলো স্পষ্ট রেখা।

তার ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে যাবার পর সে হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বললে, "আপনি খুব ভালো লোক বাবু।"

আমিও হাসতে হাসতেই বললাম, "খুব ভালো লোক, না?"

"সত্যি বলছি।"

"কি রকম?"

"আপনার আগে যে কেরানী বাবু ছিলেন, তিনি চেষ্টা করতেন ছুটিটা যাতে মঞ্জুর না হয় তার জন্য।"

আমি অগত্যা জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, কি জন্য?"

"কারণ, আর কিছু না বাবু। তার বাড়ীতে কাজ করতে রাজী হইনি। তারপর থেকেই আমার পেছনে লেগেছিলেন।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে তার এই সৎসাহসিকতাপূর্ণ প্রতিবাদকে স্পষ্ট ভাষায় মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন করে বললাম, "তুমি ঠিকই করেছিলে। সবাই তো একই চাকুরে। কাউকে অন্যায়ভাবে খাটিয়ে নেবার অধিকার কারো নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দে বলে উঠলো, "ঐ যে বললাম, সত্যিই আপনি খুব ভালো লোক। বুঝলেন বাবু, এখন আসল কথাগুলো কেউ বলে না। কিন্তু বাবু জানেন কি, কতকগুলো লেলিয়ে দেওয়া ভূত এখানকার সবাই ঘাড়েই চেপে বসে? আপনি কি আর তাদের হাত থেকে রেহাই পাবেন? অক্টোপাস যেমন কোন কিছুকে নিজের প্রয়োজনে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে, ঠিক তেমনি ঐ হুকুমনামা আর ফাইলগুলো মানুষকে যেন যন্ত্র বানিয়ে দেয়। কোনো অনুভূতিই থাকে না তার। যাকগে, আপনি শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবেন তো?"

"হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ, অন্ততঃ তোমার এই বাবুটি বদলাবে না।" হাসতে হাসতে জবাব দিলাম। মনে মনে রাগও হলো এই ভেবে যে, ওর সৎসাহসে আমি যেখানে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাই সেখানে কত পেছনে পড়ে থাকা চিন্তা নিয়ে ঐ রাজা কিনা আমার মনুষ্যোচিত মানসিক সৎসাহসের উপর হানে অনাস্থার নিদারুণ শেল। যে বৃষ্টিরাশি ভূপৃষ্ঠের শুষ্ক ভূমিতে পড়ে, তাকে সরস ও শস্যশ্যামলা করে তোলে আবার উত্তাপ-দগ্ধ বাষ্পের আকারে বিশুদ্ধ বায়ু-মণ্ডলের উপরে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকে, সেই বৃষ্টিরাশিকে যাঁরা দূষিত বলে চিন্তা করেন, তাঁরা কি অন্যায় করেন না? সে যাই হোক, ওযে আবার এতোটা স্পষ্টভাষী ও আন্তরিক তা চিন্তা করে আনন্দিত হলাম।

ওর এই রাজা নামটা কে দিয়েছিলো জানি না। কিন্তু মনে মনে সে প্রায় বাদশাহই ছিলো। সে সত্যিকারের সাহসী চাপরাশী ছিলো। কাউকে 'জো হুজুর' ভাব তো দেখাতোই না, উপরন্তু কড়া কড়া সত্যি কথা বলতে দ্বিধাবোধ করতো না। অফিসাররাও আজেবাজে কারণ দেখিয়ে আজ পাঁচ ছয় বছর তাকে চাকরীর স্থায়ী পদটি দেয় নি। তবুও রাজা তার সত্য বলার অভ্যাস ছাড়েনি।

এইভাবে আমার এক বছরের চাকুরী জীবন কেটে গেলো। এলো এবং গেলো জীবনের কত রূপ ও রূপান্তর। সংসারে আমরা ছিলাম তিন জন, হলাম চার জন। সব ছেলেই নাকি ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে তার ভাগ্যলিপি. কিন্তু আমার পুত্রের হাতে দেখলাম ছাঁটাইয়ের খাঁড়া।

চারদিকে সরকারী অফিসদপ্তরে ছাঁটাই শুরু হলো। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী

উপরতলার অফিসারদের ডেকে হুকুম দিলেন ছুটির পরেও কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে এবং বেশী কাজ আদায় করতে। অফিসাররাও কেরানীদের ছাঁটাইয়ের ভয় দেখিয়ে বেশী বেশী কাজ আদায় করতে লাগলো। পুরনো কর্মচারীরাও অফিসারদের সামনে পাকা তেঁতুল পাতার মত কাঁপতে লাগলো। আমিতো নতুন কেরানী। বি. এ. পাস করার পর এক বছর ধরাধরি করে পেয়েছি এই চাকুরী। সরু সুতোয় ঝুলানো ছাঁটাইয়ের খাঁড়া দেখে আমার মনের অবস্থা বলির ঠিক পূর্ব মুহূর্তের পাঁঠার মনের অবস্থার চাইতেও শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। অন্যদের মত আমিও অফিসারদের তোষামোদ করতে শুরু করে দিলাম। নিজের চাকুরী বজায় রাখার জন্য সবরকম চেষ্টাই করতে লাগলাম। নতুন শিশুটির দুধচোষা লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো চোখের সামনে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতো, কিন্তু নিরুপায় আমি কাজ করে যেতাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

একদিন রাজা ছুটির আবেদন নিয়ে এসে বললো, "বাবু, এই ছুটিটা একটু মঞ্জুর করিয়ে দিন না!"

তার স্বর অনুকরণ করে বললাম, "আমার ছুটিটাই মঞ্জুর করিয়ে দাও না ভাই।"

রাজা মুচকে হেসে বললো, "দিন না বাবু মঞ্জুর করিয়ে।"

উত্তরে বললাম, "তোমার ছুটি মঞ্জুর করানো আমার হাতে নেই, উপরের কর্তাদের হাতে।"

"আগেও তো ঐ কর্তাদের হাতেই থাকতো। আমার ছেলেটার খুব অসুখ। একটু দয়া করুন না বাবু!"

রাজার সঙ্গে এইসব কথায় লিপ্ত থাকাটা আমার মনে যেন তীরের মত বিদ্ধ হলো। আমি হঠাৎ চটে গিয়ে বলি, "বাচ্চার অসুখ তার আমি করবো কি? চলে যা এখান থেকে।"

রাজা কিন্তু ধমকে সরলো না। ম্লান মুখে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর যেতে যেতে বললো, "বাবু, আপনিও অন্যদের মত বদলে গেলেন! বেশ, আজ থেকে আপনার কাছে তাহলে আর কোনো দিন আসবো না; কিছুর জন্য আপনাকে বলবোও না!"

এতে ভীষণ চটে গিয়ে রাজার দরখাস্তে এমন এক নোট লিখে দিলাম যাতে তার ছুটি কোনোমতেই মঞ্জুর হতে না পারে।

কিন্তু তার কাছে ছুটি মঞ্জুর হওয়া আর না হওয়া যেন একই কথা। সে চুপ-চাপ বাড়ী চলে গেলো। আমি তাকে কাজে যোগদান করবার জন্য লিখলে সে জানালো, "ছেলের অসুখ সারে নি। সারলে আসবো।" তারপর কাজে যোগদান করলে বরখাস্তের ভয় দেখিয়ে তাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হলো। কিন্তু সে হুঁশিয়ারীর কোনো রেখাই তার মনে স্থান করে নিতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত আমার সেই 'জো হুজুরের' ফল পাওয়া গেলো। অন্য দুজন কেরানীর পরিবর্তে আমার কাজে এলো চাকরীর স্থিতি। আমার উপর কাজের চাপ বেশ একটু কম পড়তে লাগলো।

রাজার সঙ্গে আজকাল আমার আর কোনো অজুহাতেই দেখা হয় না। আর তার তাগিদই বা কোথায়? আউট অফ সাইট, আউট অব মাইণ্ড। নতুন নতুন ঢেউ মুছে দিয়ে গেলো পুরনো দাগগুলোকে।

একদিন গুম মেরে বসে আছি হঠাৎ শুনলাম, "নমস্কার বাবু।" মুখ তুলতেই রাজাকে দেখলাম সামনে দাঁড়ানো। "বাবু, বিদায় নিচ্ছি একেবারে।"

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মানে, চিরতরে মানে কি? কী ব্যাপার?"

"আপনার দয়ায় আজ আমি চাকুরী ছাড়া।" বলেই তার মুখে ফুটে ওঠে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় হাসি।

"আমার দয়ায়, মানে?"

"আপনার বোধ হয় মনে আছে, একবার আমার ছুটির আবেদন আপনি মঞ্জুর না করলেও আমি বাড়ী চলে গিয়েছিলাম। আর আপনি তাতে এমন এক নোট দিয়েছিলেন যে ফিরে এসেই পেলাম এক ওয়ার্নিং। দু'বছরে দু'বার মঞ্জুর না পেয়েই বাড়ী চলে গিয়েছিলাম বলে আজ ডিসচার্জ'ড্ হয়েছি।"

"কিন্তু তুমি এমন কাজ করলে কেন?"

"এরকম না করে কি করবো বলুন তো? আপনি তো জানেনই এখানে আমার মত লোকের ছুটি মঞ্জুর করতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়। আপনার সামনেই তো দুই দুইবার স্ত্রী আর ছেলের অসুখের সংবাদে ছুটির আবেদন করে একবার মঞ্জুর আর একবারতো জবাবই পেলাম না। এখন আপনি বলুন তো নিজের

ছেলেবউকে দূর গাঁয়ে ফেলে কি করে সোজা কাজ করে চলি। তারা যদি মরেই যায় তবে এ চাকুরীর আর দরকার কী ?"

কথাগুলো শুনে দৃষ্টি যেন ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকলো। কাছ থেকে দূরে, বর্তমান থেকে অতীতে।

অতীতের এক শীতকাল।

আমার স্ত্রী রোজ কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো আমারই প্রতীক্ষায় আর অনুযোগ করতো, "তুমি কেমন পাষণ্ড যে ওর মুখটা মনে পড়লেও তুমি বাড়ী ফিরতে পারো না ?"

আমি নিরুপায় হয়ে বলতাম, "ছাঁটাই আর বেকারী যুগের ধর্মই তো তাঁবেদারী।"

সেও চুপ হয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত এমন দিনও এলো যখন স্পন্দনহীন খোকনকে কোলে নিয়ে নিষ্প্রাণ পাথুরে মূর্তির মত আমার অপেক্ষায় তাকে উদাস চাহনীতে পথ চেয়ে থাকতো হলো।

না জানি কতক্ষণ এই দুঃখ-সমুদ্রে ভেসে চলতাম। হঠাৎ রাজা বললো, "যাদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, সেই ছেলেপুলেই যদি মরবে তো চাকুরীর আর দরকার কী, বাবু ?"

আমি আমার সহকারী বন্ধু প্যাটেলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বললাম, "আজকাল বউ-ছেলেপুলে সহজেই মেলে, কিন্তু চাকুরী-রানীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।"

রাজার মুখে ফুটে ওঠে এক বেপরোয়া হাসি। সে বললে, "এধারণা আপনার মত বাবুরাই রাখতে পারেন। আমাদের হাতসাফাই বা ভাগ্যের জোরেই দু'চার পয়সা জুটে যায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হাতসাফাই আবার কি ? নিশ্চয়ই এর আগে কোনো ধান্দাবাজি করতে।"

উত্তরে সে বললো, "তবে তা উপরতলার বাসিন্দাদের মত ডাণ্ডাবাজি নয়। এই মদ-টদ্ বানাতাম আর কি।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের মধ্যে মদের গন্ধ ঘাঁতাকলের মত ঘুরতে লাগলো। আর গা দিয়ে মদের গন্ধ পাক খেয়ে বেরুতে লাগলো।

রাজা বোধ হয় অস্বস্তির ভাবটা ঠাউরে নিয়ে ঘাড় কাত করে বললো, "আমি কিন্তু চাইনে যে আমার ছেলে এই হাতসাফাই শিখে জেলে জেলে পচে মরুক। তাই একাজ ধরেছিলাম, কিন্তু এচাকা যে ন্যায়ের বাতাসে ঘুরে না, এই তো দুঃখ।"

তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুচছে মদ তৈরীকারক কদাকার কেউ নয় বরং অন্যায় ও দাসত্বের পরম শত্রু সেই রাজা। আর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি চেহারাটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বেড়ী

শান্তারাম সবনীস

বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি এক নতুন জগতে প্রবেশ করলাম। আমার আশেপাশে অনেক লোক ঘুমন্ত ছিল। নানা ধরনের লোক। হাসপাতালে আসার পর থেকে অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো।

এক বুড়ো জমাদার। মরার আগে পর্যন্ত ছিলো বিড়ির একনিষ্ঠ প্রেমিক। সে বলতো—জীবন যায় যাক কিন্তু একে ছাড়তে পারবো না।

আমার সামনের খাটে পেটব্যথায় এক মারওয়াড়ী কোঁকাচ্ছিলো। লোকটা ঠেসে খেতে চায়।

তার খাদ্য হাসপাতালেই তৈরী হতো। তার উপর সে বাড়ী থেকে খাবার আনিয়ে নিতো। ওয়ার্ডের এক ছোট বাচ্চার জন্য আমি বিস্কুট আনিয়ে রেখেছিলাম। সেই বিস্কুটের উপরেও তার নজর পড়তো।

তার অন্যপাশে শুয়েছিলো এক তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী। তার সঙ্গে সেই তরুণীর সরস আলাপ চলতো।

এইভাবে হাসপাতালে এক মাস থাকাকালীন নানা মতের নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো।

রুগী, নার্স এবং ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার অবকাশ পাওয়া গেলো। হাসপাতা-লের এই ক্ষুদ্র জগতে অনেক করুণ, হাস্য, মধুর এবং আর্ত ঘটনা ঘটে থাকে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা সেই বাচ্চা মেয়ে, সেই কুসুম এবং আমার বৃদ্ধ এবং রুগ্ন বাবার সেই জরাগ্রস্ত স্নেহবিহ্বল মূর্তি। কিন্তু

এইসব ছাড়াও আমার মনে যদি কেউ গভীর দাগ কেটে থাকে তো সে হলো সদাশিব। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো এক কৌতুকময় অবস্থার মধ্যে।

অপারেশন করানোর দু'দিন আগে আমি হাসপাতালে প্রবেশ করেছিলাম। এই যন্ত্রণার হাত থেকে সদাশিব কয়েকদিন আগেই পেরিয়ে গেছলো। কাজেই এক ভুক্তভোগী তার সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলো।

"মশাই, অপারেশনের ব্যাপারে একটুও ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। ওতে মোটেই যন্ত্রণা হয়না। হ্যাঁ, তবে তার একদিন আগে পেছন দিক দিয়ে পেটে টিউবের সাহায্যে জল ঢোকানো হয়, ঠিক সেই সময়টাই যা একটু ব্যথা লাগে।"

শুনে আমার একটু হাসি পেলো। "এর প্রয়োগ তো আমি নিজেই কয়েকবার করেছি।" শুনে সে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো। এরপর ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব বাড়লো।

সদাশিবের উপর আমার এত কৌতূহল ছিলো যে বলার নয়। তার অবশ্য মূল কারণ সে ছিলো কয়েদী। হোলীর দিনে মদ খেয়ে সে এক কালালের* মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো। কাজেই তাকে জেলে পাঠানো হলো।

সদাশিবের সঙ্গে গল্প করার সময় মনে হতো আমি যেন এক নতুন দুনিয়ায় আছি।

সেই দিনগুলিতেই বুঝলাম যে মানবিকতা কেতাবীশিক্ষার উপরেই নির্ভর করে না। সদাশিবের মায়ামমতা লক্ষ্য করে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছি।

আমার পাশের খাটে এক আট বছরের ছেলে ছিলো। তাকে দেখার জন্য তার বাবা রোজ সন্ধ্যায় আসতো। বাকী সময়টা বেচারা একলাই পড়ে থাকতো। তার গরীব বাবা এক কারখানায় রাত্রে কাজ করতো।

"দয়া করে আমার ছেলের মশারীটা রাত্রে একটু ফেলে দেবেন।" নিজের মনকে কঠোর করে নিয়ে আশেপাশের রুগীদের এই আবেদন করে চলে যেতো। এই ছেলেটাকে সবরকম দেখাশুনার ভার সদাশিব নিজের

*মদ বা তাড়ি বিক্রেতাদের পদবী।

ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলো, কারণ, সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আজকাল চলাফেরা করতে পারে। মাঝে মাঝে এমন কি মধ্যরাত্রেও সদাশিব এই ছেলেটাকে জল ইত্যাদি দিতো। তার এই আগ্রহময় তৎপরতা দেখে কারো মনে আশ্চর্য লাগা বা কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। রাত্রে মাত্র একজন নার্স থাকতো। আর তার ঘাড়েও কাজের বোঝার অভাব নেই। কাজেই সামান্য কাজে তাকে কষ্ট দিতে কারো ভালো লাগতো না। সদাশিবের উপর পুলিসের পাহারা মোতায়েন থাকলেও কয়েদী অসুস্থ থাকায় তার বিশেষ কোনো দায়িত্ব ছিলো না। কাজেই সে নিশ্চিন্তে ঝিমোত। তাছাড়া সদাশিব হচ্ছে জেলখানার পুরনো 'বাসিন্দা'।

"আমার ছেলেটাও আজ হয়তো এত বড়ই হয়েছে। আমার জেলে আসার সময় তার বয়স ছিলো এক বছর। না জানি আজ সে কোন অবস্থায় আছে!" বলতে বলতে ঐ ছেলেটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাতো। এতে আমার মন খুব নাড়া দিতো। ঐ বাচ্চাটার জন্যই আমি বিস্কুটের কৌটা আনিয়েছিলাম। আর এই কৌটোকে কেন্দ্র করেই সদাশিব আর সেই মারওয়াড়ীর মধ্যে একটা গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো।

"এই মালদার লোকেরা তো এই ধরনেরই হয়। ভুরি ভুরি গিললেও শিশুর বিস্কুটের দিকেই এদের লোলুপ দৃষ্টি থাকে। সেই ব্যাটা শ্রীপত কালালও এই ধরনেরই ছিলো। ও তাড়িতে জল না ঢাললে আমি কেন ওর মাথা ফাটাতাম। আর আজকেই বা কেন এই পাথরভাঙা জীবন কাটাতাম।"

এইসব কথার জের টেনে সে নিজের গ্রামের অন্যান্য লোকের সম্পর্কেও কথাবার্তা পাড়তো। শ্রীপত সম্পর্কেও সে আত্মীয়তার মনোভাব পোষণ করতো। "এই শ্রীপত আমার নিবিড় বন্ধু ছিল। আমাদের বয়সও খুব বেশী তফাৎ ছিলো না। আমার মায়ের কোলে বসে দুধ খাওয়ার সময় সে সামনে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতো।" এই কথা শুনে আমি তাদের বয়সের পার্থক্য অনুমান করতে না পারলেও তার কথা আমি সাগ্রহেই শুনতাম।

"আমরা দুজনে একই আখড়ায় যেতাম। এমনিতে তা সে পরের জন্য জীবন দেওয়ার মত লোক ছিলো। সে মারা যাওয়ার পর আমারই বেশী কান্না পেলো। কিন্তু—" এটুকু বলে সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে

তারপর শ্রীপত বেশী টাকা চুকিয়ে দোকানের ঠিকা কিভাবে পেলো আর কি রকম মিথ্যা কথা বলতে লাগলো—ইত্যাদি কথা শোনাতে লাগলো।

"আমি কি আর কোনোদিন মদ খাওয়ার লোক ছিলাম! কিন্তু তাই বলে আমি তো আর এমন মুসলমান হয়ে যাইনি যে হোলির উৎসবের দিনেও মদ খাবো না।"

তার এই ধরনের কথা শুনে আমার হাসি পেয়ে যেতো। কিন্তু হাসি চেপেই আমার মনে খুব গভীর দাগ কেটে আছে।

একদিন সদাশিবকে পাহারা দেওয়া লোকটার বদলী হয়ে গেলো। পাহারা দেওয়ার জন্য এলো অন্য একটা সিপাহী। সে এসেই সদাশিবকে তার নিজের অধিকার স্মরণ করিয়ে দিলো। পুরনো সিপাহী সদাশিবেব সঙ্গে আত্মীযতাপূর্ণ ব্যবহার করতো। এই নতুন সিপাহী তো এসেই সদাশিবকে মনে করিযে দিলো যে সে কয়েদী! সদাশিব তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে হুমকী দিয়ে বলতো, "বকবক্ বন্ধ কর।" এরপরেই দেখাতো নিজের ডাঁট। সদাশিব অবশ্য তার হুমকীকে বিশেষ আমল দেয়নি। তবে হ্যাঁ, কথাবার্তাগুলো একটু আস্তে বলতো। সেইসময আমি লক্ষ্য করলাম সেই মারওয়াড়ীর মুখে মুচকি হাসি।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হলো। ওয়ার্ডের সমস্ত আলো নেভানো হলো, শুধু একটিমাত্র আলো ছিলো জলন্ত। তার অস্পষ্ট আলোতে আশেপাশের জিনিস দেখা যাচ্ছিলো। একে একে সমস্ত রুগী ঘুমিয়ে পড়লো। আমিও নিদ্রাধীন হয়ে পড়েছিলাম। মধ্য রাত্রে সদাশিব খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই সেই ছেলেটাকে জল খাওয়াতে গেলো। ঠিক সেইসময়েই ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আমি তাকে দেখতে পেলাম। ছেলেটার শরীর জ্বরে ঠকঠক করে কাঁপছিলো। একনাগাড়ে সে 'জল, জল' বলে চীৎকার করছিলো। খানিকপরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো পরদিন সকাল পাঁচটায়। চোখ মেলেই দেখতে পেলাম সদাশিবের নির্বিকার কঠোর চেহারায় নেমে এসেছে দুঃখের করুণ ছায়া।

"কী ব্যাপার সদাশিব?" উত্তরে সে নিজের পায়ের লৌহশিকল ঘড়ঘড় করে নাড়লো। ভালোভাবে জেগে দেখলাম সদাশিবের পায়ে কড়া পরানো আছে!

"কী ব্যাপার, আজ সিপাহী হঠাৎ কড়া পরিয়ে দিলো কেন?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বললো, "সেই ছেলেটা রাত্রে 'জল জল' বলে চীৎকার করছিলো। বেচারা জ্বরে ছটফট করছিলো। আমি তাকে দু' তিনবার জল খাইয়েছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমিও একবার জেগে উঠেছিলাম। তারপর?"

"সেইটাই জমাদার সাহেব দেখে নিয়ে রাত্রে যাতে আমি পালাতে না পাবি তারই জন্য আমাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে।"

"কিন্তু তোমার মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার শক্তিই বা কোথায়? এখনও তো সুস্থ হতে অনেক দেরী আছে।"

"আমিও তো সেইকথাই বলছি যে পালিয়েই বা আব যাবো কোথায়।" সেই বাচ্চাটার অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি তাকে জল খাওয়াচ্ছিলাম——"

অত্যন্ত কারুণ্যময় মুখ নিয়ে সে আমার কাছে আবেদন করলো, "আপনি জমাদারকে একটু বলে দেখুন না! এই ছেলেটাকে সেবা করতে মন আমার খুব চায়।"

বলতে বলতে তার মুখমণ্ডলে এমন কোমল ভাব প্রতিফলিত হলো এবং একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব বলে অনুভূত হলো যে এই মানুষটির হাতে কোনো দিন কোনো লোক খুন হয়েছিলো। কিছুক্ষণ পর আমি বাত্রের ঘটনা নার্সকে বলি। সেই নার্স ডেকে পাঠালো সিপাহীকে।

সদাশিব কিভাবে নিজের ছেলেকে মনে রাখে, তার মন এই ছেলেটার জন্য কিভাবে গুমরে ওঠে, তার ছাড়া পেলেও পালিয়ে যাওয়ার অবস্থা নেই, শুধু এই ছেলেটাকে সেবা-শুশ্রূষা করার মধ্যেই সে আনন্দানুভূতি পায়—ইত্যাদি কথা নার্স এবং আমি জমাদারকে বলি এবং তার পায়ের কড়া খুলে দেবার জন্য আবেদন করি।

কল্পনাতীত একাগ্রতায় জমাদার আমাদের কথা শুনলো। হয়তো সেই নার্সের যৌবনের আকর্ষণেও হতে পারে। যাই হোক—আমার অন্তুতঃ দৃঢ় ধারণা হলো সে আমাদের কথা অবশ্যই শুনবে।

"রাত্রে দেখব", বলে সে কড়া খুলে নিয়ে চলে গেলো।

আমি আর সদাশিব গোধূলিবেলার প্রতীক্ষা করছিলাম। সন্ধ্যা হতে না হতেই সেই সিপাহী কড়া নিয়ে এলো। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "আবার কেন তাকে কড়া পরাচ্ছো ?"

সে বললো, "মশাই, আপনার কথাই ঠিক। আমি এবিষয়ে খুব চিন্তা করেছি। আমারও দেশে ছেলেমেয়ে আছে। আজ যদি সদাশিবের মনে নিজের ছেলের স্মৃতি তীব্র হয়ে ওঠে, আর সে যদি পালাতে চেষ্টা করে তো আমার বউ-ছেলের অবস্থা কি হবে ? আমার মধ্যেও মানবিকতা আছে। কিন্তু— —"

এই কথা বলে মুহূর্তমাত্র দেরী না করে সদাশিবের পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলো। সদাশিব চোখ বুজে পড়ে রইলো।

কপালে তার চিন্তার রেখা পড়ছে ক্রমশঃ।

ওড়িয়া

এখনো বেঁচে আছে

গোদাবরীশ মহাপাত্র

বেনুধর কি করবে কিছু স্থির করে উঠতে পারে না।

গাঁয়েব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যখন রিলিফ অফিসের দিকে ধাওয়া করে তখন সে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে ভাবে—অত লোকের মধ্যে হাত পাতবো! ছি।—তারপর একদিন কেউ যখন যায় নি সেদিন সে ছেঁড়া জামা দিয়ে গা ঢেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট পেরিয়ে হাট পেছনে ফেলে মাঠের ভেতর দিযে যাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে থেমে যায়। বসে পড়ে কাছের বটগাছের গোড়ায়। বসে বসে ভাবে—কিভাবে রিলিফ অফিসের কাছে যাবে, কিভাবে দাঁড়াবে—হাত পেতে, না হাত ঝুলিয়ে, মাথা নুইয়ে, না মাথা সোজা করে, হাসবে, না পাংশু মুখে—কিভাবে দাঁড়াবে কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। ভাবতে থাকে—সেখানে যে থাকবে সে যদি চেনা লোক হয়, কি করবে। এইসব প্রশ্ন উঁকি মারে মনের কোণে।

সূর্য মাথার ওপর ওঠে। পাতাগুলো ভেদ করে আছড়ে পড়ে সমস্ত রোদ তার মাথার ওপরে। চিন্তায় তার মন অকূল পাথারে তলিয়ে যায়। গাছের পাখি-দের শব্দে তার চেতনা ফিরে আসে না। গাছের আড়াল দিয়ে পল্লীর দৃশ্য মানস-পটে ভেসে ওঠে—একটা অট্টালিকার চূড়ায় পতাকা উড্ডীন। সেখানে দেশসেবক, মাতৃপূজারী, জননায়ক, দরিদ্রের দরদী সবাই আছে। তার পাশেই একটি চালাঘর, সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলি মানুষ পেটে ভাত নেই, মুখে হাসি নেই। একদিন দু'দিন নয়, পাঁচদিন ধরে সেই কুঁড়ে ঘরে উনুন ধরেনি। এঁটো ভাত পড়েনি. ভাবতে ভাবতে তার চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল নেমে আসে। চোখ বন্ধ করে ভাবে আর এক দুনিয়ার কথা। তার মধ্যে বেনুধর নামক একজন যুবককে দেখতে

পায়। সবল শক্ত নিটোল দেহ কত হাসছে কত খেলছে। পড়ছে। ভাবছে, সে একদিন মানুষ হবে। গাঁয়ের ঐ নেংটা ছেলেদের একদিন মানুষ করে গড়ে তুলবে।

বেনুধর চোখ খুলে দেখে সে বসে আছে এক গাছের তলায়। হাতে বই নেই, মুখে হাসির চিহ্ন নেই, জীবনরস শুকিয়ে এসেছে। সে যাচ্ছে রিলিফ অফিসের দিকে ভিক্ষে করে ভাইবোনদের বাঁচাতে।

বেনুধর বেঁকে দাঁড়িয়ে উপরওয়ালার দিকে মুখ তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর মাথা নামায়। ভাবে, কেউ যখন যাচ্ছে না আজ, সেও আজ যাবে না। বরং ভিড়ের মধ্যে হাত পাতাটাই ভালো। কেউ দেখতে পাবে না। ফিরে গেলো ঘরে।

কিন্তু কি করবে। কাঁহাতক আর সহ্য করবে মা ভাই-বোনদের আর্তনাদ! একদিন গেলো। দুদিন গেলো। চারদিন গেলো। আটদিন গেলো। দিন-গুলো জোয়ারের মত এগিয়ে গেলো। সেই জোয়ারে তার গাঁয়ের শত শত ক্ষুধাতুর, ব্যথাতুর লোকগুলোও যেন তাদের পেট, তাদের কঙ্কাল, আর তাদের ছিন্নবস্ত্র নিয়ে স্রোতের শেওলার মত ধাবিত হয়ে রিলিফ অফিসে জমায়েত হচ্ছে। রোদের জ্বালায় মাটিও ঠিক থাকতে পারে না, ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এক ফোঁটা জল পড়লে চুপসে নেয়। রিলিফ অফিসে যে দু'মুঠো চাল দেয় লোকগুলো তা ঘরে আনে না—আঁজলা করে মুখে পুরে জিভ দিয়ে জঠরে ঠেলে দেয়।

বেনুধর দেখে চলে ঐসব। . তবু হাত পাততে ইচ্ছে করে না। আত্মসম্মানে বাধে। কনুইয়ে মুখ গুঁজে সহ্য করে বসে থাকে। কিন্তু সবকিছুর একটা সীমা আছে। সহ্যেরও তাই। তাই বেনুধরের সহ্যশক্তি একদিন ছিটকে তার নিজস্ব সীমা থেকে বেরিয়ে যায়।

রিলিফ অফিসের কাছে দাঁড়ায়। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের সেটা করাল জাদুঘর।

যেদেশে যুগ যুগ ধরে বিরাট পাথরকে দেবতা বলে মানুষ পূজো করছে, মানুষ শুনছে যে যুগে যুগে দরিদ্রের রক্ষার্থে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে, সেখানে দারিদ্র্যের চরম প্রকাশমুহূর্তেও দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি। অতগুলো মানুষ যেন শ্মশানের ধূলায় গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো যেন মরবে কি বাঁচবে ঠিক

করে উঠতে পারছে না। কারো চোখে জ্যোতি নেই, মুখে হাসি নেই, পেটে ভাত নেই, ট্যাঁকে পয়সা নেই। আছে শুধু 'দাও-দাও-দাও'য়ের ঐকতান!

বেনুধর তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সে-বিকট আর্তনাদে তার কান ঝালাপালা হয়ে গেলো। সেদৃশ্য দেখে তার চোখে দুঃখের পর্দা নেমে এলো। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করলো না তার। মুখ লুকোতে ইচ্ছা করলো। গুমরে উঠলো, পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলো তার মন।

সরে এলো পিছনের দিকে। এক পা দু'পা করে বেশ কয়েক পা পিছিয়ে এলো, বসে পড়লো একটা পাথরের উপর। তার মনে হলো যেন একটা প্রাচীন বিরাট জাতি হঠাৎ কিরকম ভিখিরি হয়ে গেলো। জীবন থাকতে অপমান বরণ করে নিলো, পথ হারিয়ে ফেললো। একটা জাতির উন্নতির বীজ ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হবার আগেই যেন অঙ্কুরে নষ্ট হতে চললো।

বেনুধর সেখানে আছে কি না বুঝতে পারলো না। ভুলে গেলো নিজেকে, ভুলে গেলো সবকিছু, শুধু একটা মানুষের শরীর সেই পাষাণবেদীতে নিষ্ফল মাথা কুটে পড়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে গরম হাওয়ার স্পর্শে, হয়তো বা চিলের আর্তনাদে তার চেতনা ফিরে এলো। বেদীর পাথরটির মতই বেনুধরও নীরবে নিস্পন্দের হতো সেখানে ঠায় বসে রইলো।

"বাবু এখানে বসে কেন?" প্রশ্ন করে একজন কৃষক। একবার নয়, প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটে দশ পনেরো বার।

বেনুধর মুখ তুলে দেখতে পেলো যেন কোনার্কের রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করা একটা প্রস্তর-মূর্তি নড়েচড়ে উঠলো তার সম্মুখে। একজন কিষাণের জীবন্ত মূর্তি।

পুনরায় প্রশ্ন আসে, "তোমার গাঁ কোথায় বাবু?"

বেনুধর তাকাতে লাগলো। সেই মূর্তিটির একটা শীতল কোমল হাতের স্পর্শ তার দেহের জামা, দেহের চর্ম, তার তলায় রক্ত, মাংস হাড় ভেদ করে হৃদয় স্পর্শ করলো। শিউরে উঠলো তার দেহ। চোখের পাতা পত্‌পত্‌ করে পড়লো। ঠোঁট থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠলো। চোখের কোণ চিক্‌ চিক্‌ করে উঠলো। কিছু বলতে চাইলো। পারলো না।

"চাল নিতে এসেছো বাবু ?"

বেনুধরের মুখ ঠেলে কোনো কথা বেরিয়ে আসতে চায় না। দলা পাকিয়ে উঠে। অনেক কষ্টে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বিড় বিড় করে বলে, "হ্যাঁ। আজ দশদিন…।"

"চলো, বাবু চলো। আজ আর চাল দিচ্ছে না। চালের জন্য যারা মুখ খুলছে তাদের মুখে বন্দুকের গুলী পুরে দিচ্ছে !"

বেনুধরের মনে হলো যেন তার পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার উপরে আকাশ নেই। একবার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠে কাতর হয়ে মাটি স্পর্শ করলো।

কৃষকটি বেনুধরের বুকে কান রেখে অদ্ভুত বিচিত্র অথচ অর্থহীন হাসিতে বলে ওঠে, "না, মরেনি, এখনো বেঁচে আছে !"

নেপালী

রোদ্দুরের প্রতীক্ষা

ভুবনেশ্বর

তাড়াতাড়ি সবগুলো সিঁড়ি বেয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে উপর তলায় উঠে যাই। দোরগোড়ায় পৌঁছে 'গোপাল' বলে ডাক দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখি গোপাল বিছানায় শুয়ে আছে। তার চোখ কোকিলের চোখের মত লাল। চোখের মণি ঘুরছে। আশঙ্কায় আমার বুক টিপ টিপ করে উঠলো। তার কপালে হাত ছোঁয়াতেই সুখানুভূতিতে সে চোখ বোজে। তার বউ চিন্তা আর রাত-জাগা চোখ মেলে বসে আছে কাছে। আমাকে দেখে সে এক অসহায় ভাব দেখালো। মুখে কিছু বললো না। কোলের শিশুটির চুল ঠিক করে দিতে দিতে নিজের চোখ মুছলো। আমি গোপালের কথা তার কাছে জিজ্ঞাস করি।

"এ কিছুতেই হতে পারে না! বিশ্বাস করো।" চোখ বুজেই গোপাল বিড়বিড় করে বলতে থাকে।

"গোপাল, কেমন লাগছে? গোপাল? আমি এসেছি, আমি বসন্ত।" আমার উপস্থিতি তাকে জানাই।

"হ্যাঁ?—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক। একাউন্ট ক্লিয়ার,······চার হাজার পাঁচশো আঠের টাকা ছ'আনা—চেক নম্বর এ-সি-ওয়ান-ওয়ান-ফাইভ-টু-জিরো-সেভেন ফাইভ···যোগ বিরসিং এণ্ড কম্পানি একাউন্ট ডি-আর-টু কেস · হ্যাঁ—হ্যাঁ পিওনকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও ··ভাউচার রেকর্ড বুকে এন্ট্রী করতে হবে।"

কখনও জোরে চিৎকার করে আবার কখনও বিড়বিড় করে আরো অনেকক্ষণ আফিসের কাজকর্মের কথা বলে যায় গোপাল।

হঠাৎ কিছুক্ষণ নীরব থাকে। আমি ভেবে পাচ্ছিনা কি করবো। আমি জানতাম না তার শরীর এত খারাপ।

"গোপাল, কি বলছো গোপাল, দেখো আমার দিকে তাকাও।" আমি তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলি।

সে বোবা দৃষ্টি মেলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে আমার দিকে তাকায় কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আবাব চিৎকার করে আফিসের কাজকর্মের কথা বলে।

"কার ওষুধ খাওয়াচ্ছো বউদি?" আমি গোপালের বউকে জিজ্ঞাসা করি।

"এখনও তো কারো ওষুধ খাওয়াতে পারিনি, ঠাকুরপো। কাল পাশের বাড়ীর গুভাজুকে* দেখিয়েছি। সে তো বললো 'বাতাস লেগেছে, ওষুধে কিছু হবে না ঝাড়ফুক আর মা কালীকে মানত দিতে হবে। কাজেই পূজো করিয়েছি। ছানা† থেকে কাল সারা ঘরে ঝাড়ফুক করে ফেলা হয়েছে।—সবই মা কালীর দয়া, ঠাকুরপো।"

"জ্বর এখন কত বউদি?"

"জানিনা তো, ঠাকুরপো", ধীরকণ্ঠে উত্তর দেয়। "আর তাছাড়া আমি কি করেই বা জানবো?"

"আমি থারমোমিটাব আর ওষুধ নিয়ে এক্ষুণি ফিরছি বউদি।" বলে আমি বেরিয়ে যাই।

নিজের বাড়ী থেকে থারমোমিটার, বাজার থেকে ওষুধ আর ফল নিয়ে আবার যাই। গোপাল তখন আরও জোরে বকবক করছে। সেই অফিসের কথা। উঃ, গা পুড়ে যাচ্ছে! থারমোমিটার দিযে দেখি একশো চার জ্বর। কপালে জলপটি দিই।

বিড়বিড় করে বলছে—"চারে-চারে বারো– পাঁচ-আষ্টে তেইশ।"

"এক্ষুনি গুভাজু আবার এসেছিলো। মা কালীর পূজো আর একবার করতে বলে গেছে।"– গোপালের কপালে জলপটি ঠিক করে দিতে দিতে তার বউ বলে।

* নেপালী বৌদ্ধ পুরোহিত ও ওঝা।

† নেপালীদের বাড়ীর টালি বা ওধরনের চাল।

"অঃ। বলে যখন গেছে করুন।"—আমি ধীর কণ্ঠে বলি। ভাবলাম কোনো না কোনো অবলম্বন থাক। এই কাল্পনিক বিশ্বাস নিয়েই তো মানুষ শত শত শতাব্দী ধরে জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে। তর্কের ধোপে হয়তো সে বিশ্বাস আর আস্থা টিকবে না।

জীবনের সব দিকে বঞ্চনা আর নৈরাশ্যের করাল ছায়া! তারই মাঝে গোপালের বউ আজ দেখছে অন্ধ বিশ্বাসের ধোঁয়া। ডাক্তারকে দেখাতে বলার উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল, অত টাকা নেই। মাইনে পেতে এখনও দশ দিন বাকী। মাত্র ষাট টাকা মাইনে পায়। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

গোপালের বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকাই। মায়ের কোলে বসে সে আঙুল চুষতে চুষতে জানালা দিয়ে বোবা দৃষ্টি মেলে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। লাউড স্পীকারের আওয়াজ—আনারকলি—জনসেবা সিনেমা হলে—আনারকলি—। আর ঘরে গোপালের মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছে, পাঁচ-পাঁচ দশ-ছই-ষোল।

আমার বেজায় অস্বস্তি লাগলো। বুকে কে যেন হাতুড়ী পিটছে। আমি গুমরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি, কিছু তো করতেই হবে। এই অবস্থায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা আর চলে না।

ঠিক এই সময়ে একজন লোক দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। গোপাল বিড়-বিড় করে বকে যাচ্ছে, "চারে চারে বারো"—

"গোপাল বাবু, গোপাল বাবু!"

"আঃ! কানের পর্দা ফাটিয়ে ফেলবে নাকি—আমি কি কালা?—দাঁড়াও আগে ব্যালেন্স মিলিয়েনি, তারপর তোমার কেসটা দেখবো!—গোপাল চোখ বুজেই বকে যায়।

লোকটি কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে গোপালের দিকে তাকায়। সে যেন অবস্থাকে অনুভব করার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে তার মোটা খাকি কোটের পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে আমাকে দেখিয়ে বলে, "দেখুন বাবু, গোপাল বাবুর জ্ঞান হলে জানিয়ে দেবেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পুট আপ্ না করায় মেডিকেল লীভের পরিবর্তে ম্যানেজার তাকে একেবারে 'লীভ' দিয়েছেন—বিনা নোটিসে তিনদিনের বেশী কামাই হয়ে যাবার অজুহাতে।"

মেডিকেল সার্টিফিকেট যারা দিতে পারে না, তাদের ম্যানেজার কত উদার ভাবেই না 'একেবারে লীভ' দেয়!

ঐ চিঠি দিয়ে অফিসের পিওন চলে যায়। গোপালের বউ অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন আর জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। গোপাল বিড়বিড় করে বলে আফিসের কাজকর্মের কথা।

ঈশ্বরের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। মেঘের বুক চিরে আসা রোদ্দুরের প্রতীক্ষায় পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষ।